সত্যব্রত

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না! কয়েকদিন আগে কিন্তু এমনি করিয়া মেঘ সাজিয়া সন্ধ্যার পরে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ মেঘ দেখিয়া মনে হইল, আকাশের বুকের জল এখনও চোখে ওঠে নাই। মেঘের ছিদ্র দিয়া পরপারে শূন্য বিস্তার আকাশের তীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহে সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। আমার ঘরের উন্মুক্ত জানালা দিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম।

আমার এই ছোট ঘরটিতে কি যেন মায়া ছড়ান। এই ঘরটিতেই আমার বিশ্বের সকল পরিচয়, সকল রস, সকল সমাচারে ভরা থাকে। এই ঘরটিতে বসিয়া দুরন্ত যৌবনের জীবনস্মৃতি পাঠ করি; জীবনের রাজপথে যাহাদের সঙ্গে খেলিয়াছিলাম তাহাদের কথাও মনে করি।

জনহীন ঘরটিতে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, কত তারিখ আর মনে করিয়া রাখিব? তারিখগুলি যেন এক একখানি ছবি। এক একটা তারিখ এক একটা মহোৎসবের আলেখ্য, পরাজয়ের কাহিনী, বিচ্ছেদের, বিস্ময়ের শব্দহীন অনুলিপি!

আমার মনের একটা কোণে তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে, পশ্চিমাকাশের সূর্য্যাস্তের শেষরশ্মির মত উজ্জ্বল অথচ শ্রীমন্ত।

বয়স অনেক আগাইয়া গিয়াছে, মন ছোট শিশুর মত এখনও পথ চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া কেবলই কি দেখে।

মাথার চুল পাকিল কিন্তু মনের ভুল ভাঙিল না।

বিশ্বের জনকলরবের জয়োল্লাস থামিয়া গিয়াছে। আজ মন যেন ছুটি চায়। কোনও কাজ নয়, শুধু একটু ছুটি। জ্যোৎস্না রাত্রে পদ্মার বালুচরের মত নিশ্চিন্ত আলস্যে আজ মন যেন শুধু পড়িয়া থাকিতে চায়।

আলো নিভাইয়া দিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশের ম্লান আলোকটুকু জানালার একটা ফাঁক দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। জানালার পাশেই চৌকীটা। মনে হইতেছিল কে যেন শুইয়া আছে। ঐ আলোকটুকুই তাহার দেহ; রূপে ভরা কিন্তু ছোঁয়া যায় না।

কখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুমটুকু ভাঙ্গিয়া গেল।

মনে হইল অনেক রাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে ঘড়ি দেখা যায় না।

একটু নড়িয়া বসিতেই কে আমাকে স্পর্শ করিল। একখানি হাত আমার গলায় কে জড়াইয়া দিল। বিস্ময়ের কথা! মনে মনে হাসি পাইল। আমার যৌবনের অতিথিশালায় যাহারা প্রবাস-বাস করিয়া গিয়াছে তাহারা ত কেহ কাছে নাই!

তবু বড় ভাল লাগিল। মন শীতল হইয়া গেল, চোখ বুজিয়া আসিল। আমি সেই হাতখানির উপর মাথাটি শুধু এলাইয়া দিলাম। চোখ ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা অনুভব করিতেছিলাম সে টুকুকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলাম। বাকীটা যদি মিথ্যা হয়? আবার এটুকুও মিথ্যা হইয়া যাইবে!

সে ভয়টুকু এখনও আছে!

কিন্তু সে ছাড়িল না। সে কথা বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, চিন্‌তে পারলে?

আমি হেলায় হাসিয়া উত্তর করিলাম, চিন্‌তে চাই না।

সে বলিল, আজ তুমি বড় শ্রান্ত। তাই তোমার মনটিকে খালি পাব আশা করেই এসেছি।

আমি তেমনি আলস্যজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, তোমার বিশেষ অনুগ্রহ!

কথা বলিতে ভাল লাগিতেছিল না।

সে নিজের পরিচয় নিজে দিল।—আমি ঐ বাড়ীটাতে থাকি। সারাদিন তোমার ঘরে লোকের আনা-গোনা দেখে ভাবতাম তুমি বুঝি কোনও জ্যোতিষী হবে। লোকের ভাগ্যগণনা কর।

আমি চোখ বুজিয়াই একটু হাসিলাম।

সে একটু থামিয়া গেল। হয় ত বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আবার বলিতে লাগিল, কিন্তু রাত্রেও লোক আসে দেখি। শুধু গভীর রাত্রে একটা সময়ে লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখনও তোমার ঘরে আলো জ্বলে। তুমি একলা বসে থাক। নয় ত ঘরের বাইরে বারান্দা টুকুতে বেরিয়ে এসে, ছায়ামূর্ত্তির মত অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিকে চলে বেড়াও। কতদিন ভেবেছি, এই বুঝি আমাকে তুমি দেখে ফেললে। কিন্তু তুমি এমন লোক, একদিন ফিরেও তাকাও নি আমার দিকে!

মনটা ভরিয়া উঠিল। কথাগুলি এখন যেন ভালই লাগিতেছিল।

সে বলিতে লাগিল, আমি কতদিন গান গেয়ে তোমাকে আমার খবর পাঠিয়েছি। তুমি হয় ত সে গান শুনেছ, কিন্তু খবরটুকুই পাও নি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের খবর?

আমি যে তোমার খবর রাখি সে খবরই তোমাকে জানাতে চেয়েছি।

আমার আবার কি খবর তুমি জান?

আমি একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। মানুষের মন ত, চুরি বিদ্যা ধরা পড়িবার কথা সকলেরই মনে পড়ে।

সে হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল। তার বুকের নিশ্বাস তখন আমার বুকে আঘাত করিতেছিল। সে আমার বুকের উপরই পড়িয়াছিল।

সে বলিয়া উঠিল, তুমি যে একা নও সেই খবর।

আমি জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, তুমি নিজের চোখে দেখেছ বলছ আমার কাছে দিবা-রাত্র লোক আসে; এত সঙ্গী থাকতে আমি একা হতে যাব কেন?

সে কাঁপিতেছিল। আমি তাহাকে স্থির হইতে বলিলাম। সে কাঁপা গলায় বলিল, আমাকে কি তুমি এখনও চিনতে পার নি আমি কে?

আমি উত্তর করিলাম, চিনেছি, চিনেছি বলেই এত কথা ভাবছি।—কেন তুমি এত রাত্রে এমন করে এলে?

সেই অল্প অন্ধকারে সে তাহার মুখখানি আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তার চোখ দেখিতে পাই নাই, জানি না তার চোখে তখন কি ভাষা লেখা ছিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে যে আকুতি তাহা বড় পবিত্র মনে হইল।

এমন করিয়া যাচ্ঞা করিলে বোধ হয় বিধাতার কাছেও সে অনুকম্পা পাইত।

আমি বলিলাম, বাড়ী ফিরে যাও।

সে তখন আমারই কোলের কাছে লুটাইয়া পড়িয়াছে। মিনতির স্বরে বলিতে লাগিল, আমাকে থাকতে দাও, তোমার কাছে থাকতে দাও। আমি তোমার অনাদৃত অভিলাষের সেবা করব, আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

আমার বয়স হইয়াছে; বিগত দিনের অনেক কথাই মনে হইল। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, তা হয় না, ফিরে যাও। যারা এমন করে আসে তারা থাকতে আসে না। সোনার হরিণ তাদের গহন বনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তাদের মনের হরিণ সোনার হরিণের পিছু ঘুরিয়া মনের আশ্রয়টুকুও হারিয়ে ফেলে।

কয়েক বৎসর পরে এমনি এক স্তব্ধ সন্ধ্যায় একখানি চিঠি পাইলাম। হাতের লেখা দেখিয়া চিনিলাম।

সেই একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিবার আগে সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল, আমি যেন তাহার অধিকারটুকু হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করি।

তাহাই করিয়াছি।

নিজের ভালবাসার অপমান সহ্য করা যায়, কিন্তু অন্য কেহ ভালবাসিলে তাহার অসম্মান করা কঠিন।

চিঠিখানি আমার চোখের সামনে পড়িয়াছিল, পড়িতে ইচ্ছা হইল না। এখন দুইটি জিনিষ কেবল ভাল লাগে। অবিশ্রান্ত কাজ, নয় ত ঘুম। চিঠি পড়িয়াই রহিল। বাতি নিভাইয়া শুইতে গেলাম। রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। ছোট ভাই ডাক্তারী পড়িত, একটা মানুষের কঙ্কাল দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। হঠাৎ আমার হাতটা তাহাতে ঠেকিয়া গেল। অন্ধকার বলিয়াই হয় ত বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। রাতটা কাটিয়া গেল।

প্রভাতে নূতন সূর্য্য পুরাতন পৃথিবীর দিক্‌প্রান্তে আবার দেখা দিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে পাড়ি দিয়া আবার দিবসের আলোর সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে।

চিঠিখানা খুলিয়া পড়িলাম। বহুদিন পূর্ব্বে রাত্রির অন্ধকারে যে কথা সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল আজ দিনের আলোয় তাহা শুধু একখানি চিঠি।

লেখা আছে ;—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সে-দিন রাত্রে আপনি অমন করে ফিরিয়ে না দিলে আমি এতখানি সুখী হতে পারতাম না। আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসেন, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা অনেক গল্প করেছি। শুধু সে রাত্রের কথাটা আর বলি নি; যদি তিনি আপনার সম্বন্ধে কিছু খারাপ ভাবেন। আমাদের খোকাটি বড় সুন্দর হয়েছে, দুষ্টুও তেমনি। তার নাম রেখেছি সত্যব্রত। বেশ নাম না?

আপনি এখনও কি সেই ঘরটিতে বসে তেমনি কাজ করেন? আমরা যে বাড়ীটাতে ছিলাম সে বাড়ীতে এখন কারা এসেছে? ঐ বাড়ীটা থেকে আপনার ঘরটা বড় বেশী দেখা যায়। একটুও আবরু থাকে না। আপনার জানালায় একটা পর্দ্দা টানিয়ে নিলেই পারেন। ইতি—

অমলা রায়

চিঠিটা পড়িয়াই হঠাৎ চোখ পড়িল ঐ বাড়ীটার দিকে। একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাকাইয়া আছে। বোধ হয় তারা নতুন ভাড়াটিয়া।

আমার কাছে কিন্তু নূতন ঠেকিল না।

গজল গান

নজরুল ইস্‌লাম

দুরন্ত বায়ু পূরবাইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে
মৃদঙ্গ গুরু গুরু বাজে
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে॥
ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী
খোঁজে সে তারা চন্দে॥
মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যূথি বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি কদম্ব-গন্ধে॥
একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে॥
দিনান্তে বসি কবি একা
পড়িস্ কি জল-ধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥
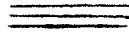
ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি তেমনি ফাঁকা ॥

আগে মন কর্‌লে চুরি মর্ম্মে শেষে হান্‌লে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখ্‌লে চাঁদে দূর থেকে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝুলে তেমনি জলে চলে বলাকা ॥

বকুলের তলায় দোদুল্ কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা ॥

তরুরা রিক্ত-পাতা আস্‌লো লো তাই ফুল্-বারতা
ফুলেরা গ'লে ঝ'রেছে ব'লে ভ'রেছে ফলে বিটপী-শাখা ॥

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস্‌রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা ॥

অভিমান

শ্রীবিমলাচরণ বিদ্যারত্ন

প্রবাদ আছে, "দুঃখের উপর টনকের ঘা", শ্যামবাবুর তাহাই হইল। এ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বিয়োগের অব্যবহিত পরে যে তাঁহাকে এতখানি শোক আবার মাথা পাতিয়া সহিতে হইবে, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শ্যাম বাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটীই বড় নাম কমলা, পুত্রের নাম সরোজ। শ্যাম বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমলাকে সুপাত্রেই অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরে যখন কমলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল, তাহার মাস ছ'য়েক পরেই ছয় দিনের জ্বরে কমলার স্বামী অমিয় বাবু ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন। শ্যাম বাবুর যেন বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গেল। সরোজ গিয়া কমলাকে লইয়া আসিল।

কমলা পিত্রালয়ে আসিয়াও শান্তি পাইল না। শ্যাম বাবু কন্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কমলা বিধবা হওয়ার পর দুই তিন মাস নিদারুণ শোক সহ্য করিয়া পরিশেষে সকল শোক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

তাহার অবোধ শিশু সরোজের স্ত্রী নীহারকে পাইয়া মায়ের শোক একরূপ ভুলিয়া গেল।

খোকা নীহারের কোলে লালিত পালিত হইয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। শ্যাম বাবু তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন, নীলমণি। নীলমণি দাদা মহাশয়ের বড় ভক্ত। ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আর একটী বছর কাটিয়া গেল। শ্যাম বাবু হৃদরোগে দেহত্যাগ করিলেন। নীলমণির দাদার অভাব আবার নীহারই পূর্ণ করিয়া দিল।

সরোজ সাধ্যানুসারে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিল এবং তাহার পর নীলমণির শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে মানুষের সকলই সহিয়া যায়, নীলমণি দাদার শোক একরূপ ভুলিয়া গেল। নীহারের কোন সন্তানাদি ছিল না, সে নীলমণিকেই পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিল। নীলমণি নীহারকে "মা" বলিয়া ডাকিত, তখন নীহারের মাতৃহৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নীলমণিকে নীহার খোকা বলিয়াই ডাকিত।

নীলমণি নীহারের হাতে না খাইলে পেট ভরিত না, নীহারের কাছে না শুইলে ঘুম হইত না। সে পাঠশালা হইতে সদর দরজায় আসিয়া "মা, খাবার দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিত। নীহারও দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত হইতে বইগুলি লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিত। অবোধ শিশু তখন নিজের মনে পাঠশালার কত রকম গল্প অজস্র বলিয়া যাইত, খাওয়ার কথা তাহার মনেই থাকিত না।

একদিন নীলমণি পাঠশালা হইতে আসিতে আসিতে যখন তাহার পরণের কাপড়টা খুলিয়া গেল, তখন বই হাতে কোমরের কাপড়টা ঝাপ্‌টাইয়া ধরিয়া গৃহের সদর দরজায় আসিয়া, "মা, শীগ্‌গির এসো" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। নীহার দেখিল তাহার কাপড়টা ধুলোয় ভরিয়া

গিয়াছে, কাপড়টা কোমরের উপর ঝাপ্টাইয়া ধরিয়া আছে, এবং তাম্বূলচর্ব্বনে তাহার ওষ্ঠাধর লাল হইয়া গিয়াছে। নীহার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, পান কোথায় খেলি রে?—বলিয়া নিকটে আসিয়া তাহার হাত হইতে বইগুলো লইতেই নীলমণি বলিল, আগে আমায় কাড়পটা পরিয়ে দাও।

না বাবা আমার! চল তোমায় একটা অন্য কাপড় পরিয়ে দিই গে, এ কাপড়টা ময়লা হয়ে গ্যাছে, এটা প'রতে নেই।

বলিয়াই নীহার নীলমণিকে কোলে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। নীলমণি বলিল, মা, আমি খুব সুন্দর সুন্দর গান শিখেচি।

নীহারের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল, সে বলিল, কি গান শিখেচিস্ রে?

নীলমণি মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল—

"এমন মোহন নয়নের ছল
কোথা হ'তে বঁধু আন।"

আর মনে পড়ে না মা। বলিয়া নীলমণি চুপ করিল।

নীহার বলিল, কে তোকে এ গান শেখালে?

কেন মা সেই ভদ্রলোকের মেয়েরা।

কোথায় রে।

নীলমণি হাত বাড়াইয়া বলিল, সে অনেক দূরে, আমাদের পাঠশালের কাছে।

নীহারের মনটা যেন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ভরিয়া গেল, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, সেখানে কি করে গেলি রে।

কেন তারা আমায় ডাকলে, কত আজ মিষ্টি খাইয়েচে, তারা বলেচে আমায় গান শিখিয়ে দেবে। তারা খুব ভাল মা, হাতে তোমার মতন এমনি সোনার চুড়ি গয়না সব।

কোন পতিতা যে নীলমণিকে আদর করিয়াছে তাহা বুঝিতে নীহারের বাকী রহিল না। সে শঙ্কিত প্রাণে নীলমণিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আর ওদের ওখানে যেও না বাবা।

কেন মা, তারা ত খুব ভালবাসে।

তা বাসুক, আর যেয়ো না।

যদি তারা আমায় কোলে করে নিয়ে যায়?

নীহার বড়ই চিন্তিতা হইল, কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু মনে মনে ভাবিল, ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

খোকা লক্ষী বাবা আমার, এসে খেয়ে নে।

নীলমণি দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, না আমি খাব না।

লক্ষী বাবা আমার, এসো।

বলিয়া নীহার খোকাকে কোলে করিয়া আনিয়া খাবারের সম্মুখে বসাইয়া দিল। নীলমণি হাত পা ছুঁড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। নীহার তাহাকে পুনরায় কোলে তুলিয়া বলিল, মাণিক আমার, খেয়ে নে, দেখ্ এখনও আমি খেতে পাই নি।

নাইবা খেলে তুমি, আমার কি?

হাঁরে, এইজন্যে তোকে এত কষ্ট করে মানুষ কচ্চি!

এত কষ্ট কচ্চো কেন, আমি কি বলেচি?

বলিয়া নীলমণি কাঁদিয়া ফেলিল। নীহার একটু হাসিয়া বলিল, পেট্টা খালি হ'য়ে রয়েচে, খেয়ে নাও ধন আমার।

নীলমণির অভিমান আরও চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল; সে ঠোঁট ফুলাইয়া নীহারের অলকগুচ্ছ টানিতে টানিতে বলিল, না, আমি খাব না, আমার ইচ্ছা।

নীহার বলিল, আচ্ছা আজ তবে নিশ্চয় মাষ্টারকে বলবো।

তাই ব'লো।

বলিয়া নীলমণি নীহারের কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নীহার হাসিতে হাসিতে তাহার মুখে একটি চুম্বন আঁকিয়া দিল। এমন সময় সরোজ বাবু আসিয়া

অভিমান

শ্রীবিমলাচরণ বিদ্যারত্ন

প্রবাদ আছে, "দুঃখের উপর টনকের ঘা", শ্যামবাবুর তাহাই হইল। এ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী বিয়োগের অব্যবহিত পরে যে তাঁহাকে এতখানি শোক আবার মাথা পাতিয়া সহিতে হইবে, তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। শ্যাম বাবুর একটী পুত্র ও একটী কন্যা। কন্যাটীই বড় নাম কমলা, পুত্রের নাম সরোজ। শ্যাম বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমলাকে সুপাত্রেই অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরে যখন কমলা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল, তাহার মাস ছ'য়েক পরেই ছয় দিনের জ্বরে কমলার স্বামী অমিয় বাবু ইহসংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন। শ্যাম বাবুর যেন বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গেল। সরোজ গিয়া কমলাকে লইয়া আসিল।

কমলা পিত্রালয়ে আসিয়াও শান্তি পাইল না। শ্যাম বাবু কন্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কমলা বিধবা হওয়ার পর দুই তিন মাস নিদারুণ শোক সহ্য করিয়া পরিশেষে সকল শোক দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল।

তাহার অবোধ শিশু সরোজের স্ত্রী নীহারকে পাইয়া মায়ের শোক একরূপ ভুলিয়া গেল।

খোকা নীহারের কোলে লালিত পালিত হইয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। শ্যাম বাবু তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেন, নীলমণি। নীলমণি দাদা মহাশয়ের বড় ভক্ত। ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আর একটী বছর কাটিয়া গেল। শ্যাম বাবু হৃদরোগে দেহত্যাগ করিলেন। নীলমণির দাদার অভাব আবার নীহারই পূর্ণ করিয়া দিল।

সরোজ সাধ্যানুসারে পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিল এবং তাহার পর নীলমণির শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে মানুষের সকলই সহিয়া যায়, নীলমণি দাদার শোক একরূপ ভুলিয়া গেল। নীহারের কোন সন্তানাদি ছিল না, সে নীলমণিকেই পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিল। নীলমণি নীহারকে "মা" বলিয়া ডাকিত, তখন নীহারের মাতৃহৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নীলমণিকে নীহার খোকা বলিয়াই ডাকিত।

নীলমণি নীহারের হাতে না খাইলে পেট ভরিত না, নীহারের কাছে না শুইলে ঘুম হইত না। সে পাঠশালা হইতে সদর দরজায় আসিয়া "মা, খাবার দাও" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিত। নীহারও দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত হইতে বইগুলি লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিত। অবোধ শিশু তখন নিজের মনে পাঠশালার কত রকম গল্প অজস্র বলিয়া যাইত, খাওয়ার কথা তাহার মনেই থাকিত না।

একদিন নীলমণি পাঠশালা হইতে আসিতে আসিতে যখন তাহার পরণের কাপড়টা খুলিয়া গেল, তখন বই হাতে কোমরের কাপড়টা ঝাপ্‌টাইয়া ধরিয়া গৃহের সদর দরজায় আসিয়া, "মা, শীগ্‌গির এসো" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। নীহার দেখিল তাহার কাপড়টা ধূলোয় ভরিয়া

গিয়াছে, কাপড়টা কোমরের উপর ঝাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আছে, এবং তাম্বুলচর্ব্বনে তাহার ওষ্ঠাধর লাল হইয়া গিয়াছে। নীহার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, পান কোথায় খেলি রে?—বলিয়া নিকটে আসিয়া তাহার হাত হইতে বইগুলো লইতেই নীলমণি বলিল, আগে আমায় কাড়পটা পরিয়ে দাও।

না বাবা আমার! চল তোমায় একটা অন্য কাপড় পরিয়ে দিই গে, এ কাপড়টা ময়লা হয়ে গ্যাছে, এটা প'রতে নেই।

বলিয়াই নীহার নীলমণিকে কোলে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। নীলমণি বলিল, মা, আমি খুব সুন্দর সুন্দর গান শিখেচি।

নীহারের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল, সে বলিল, কি গান শিখেচিস্ রে?

নীলমণি মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল—

"এমন মোহন নয়নের ছল
কোথা হ'তে বঁধু আন।"

আর মনে পড়ে না মা। বলিয়া নীলমণি চুপ করিল।

নীহার বলিল, কে তোকে এ গান শেখালে?

কেন মা সেই ভদ্রলোকের মেয়েরা।

কোথায় রে।

নীলমণি হাত বাড়াইয়া বলিল, সে অনেক দূরে, আমাদের পাঠশালের কাছে।

নীহারের মনটা যেন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ভরিয়া গেল, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, সেখানে কি করে গেলি রে।

কেন তারা আমায় ডাকলে, কত আজ মিষ্টি খাইয়েচে, তারা বলেচে আমায় গান শিখিয়ে দেবে। তারা খুব ভাল মা, হাতে তোমার মতন এমনি সোনার চুড়ি গয়না সব।

কোন পতিতা যে নীলমণিকে আদর করিয়াছে তাহা বুঝিতে নীহারের বাকী রহিল না। সে শঙ্কিত প্রাণে নীলমণিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আর ওদের ওখানে যেও না বাবা।

কেন মা, তারা ত খুব ভালবাসে।

তা বাসুক, আর যেয়ো না।

যদি তারা আমায় কোলে করে নিয়ে যায়?

নীহার বড়ই চিন্তিতা হইল, কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু মনে মনে ভাবিল, ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

খোকা লক্ষ্মী বাবা আমার, এসে খেয়ে নে।

নীলমণি দূরে দাঁড়াইয়া বলিল, না আমি খাব না।

লক্ষ্মী বাবা আমার, এসো।

বলিয়া নীহার খোকাকে কোলে করিয়া আনিয়া খাবারের সম্মুখে বসাইয়া দিল। নীলমণি হাত পা ছুঁড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। নীহার তাহাকে পুনরায় কোলে তুলিয়া বলিল, মাণিক আমার, খেয়ে নে, দেখ্ এখনও আমি খেতে পাই নি।

নাইবা খেলে তুমি, আমার কি?

হাঁরে, এইজন্যে তোকে এত কষ্ট করে মানুষ কচ্চি!

এত কষ্ট কচ্চো কেন, আমি কি বলেচি?

বলিয়া নীলমণি কাঁদিয়া ফেলিল। নীহার একটু হাসিয়া বলিল, পেটটা খালি হ'য়ে রয়েচে, খেয়ে নাও ধন আমার।

নীলমণির অভিমান আরও চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল; সে ঠোঁট ফুলাইয়া নীহারের অলকগুচ্ছ টানিতে টানিতে বলিল, না, আমি খাব না, আমার ইচ্ছা।

নীহার বলিল, আচ্ছা আজ তবে নিশ্চয় মাষ্টারকে বলবো।

তাই ব'লো।

বলিয়া নীলমণি নীহারের কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নীহার হাসিতে হাসিতে তাহার মুখে একটি চুম্বন আঁকিয়া দিল। এমন সময় সরোজ বাবু আসিয়া

উপস্থিত হইল। সরোজ বাবুকে নীলমণি যমের ন্যায় ভয় করিত, সে সরোজ বাবুকে আসিতে দেখিয়া চোখের জল মুছিয়া আহারে বসিল, নীহার তাহার পার্শ্বে বসিয়া বাম হস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে খাওয়াইয়া দিল। নীলমণিও আর কোন দ্বিরুক্তি করিল না।

এইরূপ সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া যখন আঠার বছর কাটিয়া গেল, নীলমণি তখন, আই, এস্ সি, পাশ করিয়া বি, এস সি, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নীহার আর প্রাণের গোপন বাসনা লুকাইয়া রাখিতে পারিল না, স্বামীকে ধরিয়া বসিল, খোকার বিয়ে দাও।

সরোজ বাবু বলিল, খোকা আগে বি, এস সি-টা পাশ করুক তারপর দেখা যাবে।

কেন তুমি কি আমায় বি, এস সি পাশ করে বিয়ে করেছিলে ?

সরোজ একটু মুচ্ কি হাসিয়া বলিল, আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে বিয়ে করেছিলাম।

কেন, আমি কি তোমায় পায়ে ধরে সেধেছিলাম ?

না, গো না, তা নয়, আমি তাড়াতাড়ি মত না দিলে তোমার মত সাত রাজার ধন মাণিকটী হাতছাড়া হ'য়ে যেত।

এও যদি তাই হয়।

তার মানে ?

তার মানে আবার কি ? আমি মেয়ে ঠিক করেচি, আস্চে ফাল্গুনেই আমি খোকার বিয়ে দেব।

তুমি আবার কোথায় ঠিক কল্লে ?

যেখানেই হোক্ না, তুমি বিয়ে দেবে কিনা বল।

কোথায় না শু'নলে কেমন ক'রে বলব।

দত্তদের বাড়ীতে।

সরোজ কিছুক্ষণ নিজের মনে ভাবিয়া লইয়া বলিল, ওদের বাড়ীতে সুবিধা হবে না।

কেন ?

ওদের বাড়ীর মেয়েরা শিক্ষিতা, তোমার সঙ্গে খাপ্ খাবে কেন ?

ঐ তোমাদের মস্ত ভুল, শিক্ষিতা না হলেই বুঝি সে চোরের দায়ে ধরা পড়েচে, না ? আর আমার সঙ্গে খাপ্ খাক্ বা না খাক্, বিয়ে দিতেই হবে। অমন টুক্‌টুকে বৌ আর হবে না।

দেখ তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমি মানা করতে চাইনি, কিন্তু শেষে পস্তাবে।

তুমি এমন অমঙ্গলে কথা বলো না।

তোমার পায়ে পড়ি মা, ও অনুরোধ ক'রো না আমায়।

হাঁ রে খোকা, এত নিষ্ঠুর কবে থেকে হ'লি তুই ?

মা ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ না ক'রলে বড় ঠ'কতে হয়, তাই বলচি মা, ওদের বাড়ীর মেয়ে এনো না।

হাঁ রে, তোকে এত কষ্ট করে মানুষ ক'রলাম এই জন্যে ?

বলিতে বলিতে নীহারের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া গেল। নীহারের ক্রন্দনে নীলমণিরও চোখের জল আসিল, সে বলিল, ওর জন্যে কাঁদছ কেন মা, তুমি কি নিজেই বুঝতে পাচ্চো না যে, ওদের সঙ্গে আমাদের—

নীহার নীলমণির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আমি যে তাদের মত দিয়েচি বাবা, আর অমত করিস্ নে।"

নীলমণি নীহারের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু কঠোর স্বরে বলিল, ওখানে বিয়ে করলে সুখী হবে তুমি ?

নীলমণির কণ্ঠস্বর কঠোর হইলেও যে তাহার মধ্যে একটা দুর্জ্জয় অভিমান লুকান রহিয়াছে তাহা বুঝিতে নীহারের বিলম্ব হইল না। সে সংযত কণ্ঠে বলিল, হাঁ বাবা, সুখী হ'ব, খুব সুখী হব, তুই অমত করিস্ নি।

আচ্ছা তবে তাই কর, আমার কোন অমত নেই।

বলিয়া নীলমণি গৃহের বাহির হইয়া গেল। নীহার স্বামীর নিকটে গিয়া বলিল, ওগো, তুমি তবে আজ যাও একবার।

কোথায় ?

দত্তদের বাড়ী।

নীরুর মত হ'য়েচে ?

নীহার একটু সাফল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, তা হ'বে না, খোকা না আমার ছেলে। আমি বল্লে, সে কখনও অমত করতে পারে!

কি জানি কেন সরোজের বুক খালি করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। নীহার বলিল, চুপ করে রৈলে যে ?

আচ্ছা, যা-যা ক'রতে হয় আজই ব্যবস্থা কচ্চি।

কি হোল মা, কাঁদচ কেন ?

কই বাবা, আমি ত কাঁদিনি।

বলিয়া নীহার পিছু ফিরিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইল।

নীলমণি বলিল, এখন আর কাঁদলে কি হ'বে মা, আমি ত আগেই বলেছিলাম, ওখানে বিয়ে দিও না।

নীহার জোর করিয়া মলিন মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিল, কেন রে পাগল, কি হ'য়েচে ?

এখনও স্বীকার ক'রবে না ? আচ্ছা, এর পর বেশ বুঝতে পারবে।

কি পাগলের মত বকিস্ খোকা!

আমি পাগল নই মা, এর পর রীতিমত বুঝতে পারবে, তার সূত্রপাত হ'য়েচে, আর শুধু যে তোমাকে ভুগ্‌তে হবে তা নয়, আমাকে সুদ্ধ এই সঙ্গে একটু একটু করে পুড়্‌তে হবে।

নীহার একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, ও, বড় বুদ্ধিমান হ'য়েচিস্ দেখ্‌চি, খুব ভবিষ্যৎবক্তা তুই, চুপ্ কর্।

ভবিষ্যৎবক্তা নই মা, তোমার বৌ-মা কি বলে শু'নবে তাহ'লে ?

নীহারের মুখখানা আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, কি বলে রে পাগল ?

৬

হেসো না মা, শোন, সে বলে, এমনি ধারা কষ্ট করে এখানে থাক্‌তে পারব না, তুমি কলকাতায় একটা চাকরি জোগাড় করে নিয়ে আমায় নিয়ে চল। আমি বল্লুম, কষ্ট আবার কি, তোমাকে ত কিছুই কাজ ক'রতে হয় না। তা ছাড়া মা তোমাকে এত স্নেহ করেন, আর মায়ের অমতে কেমন করে কলকাতা নিয়ে যাবো তোমায় ? তাতে সে রেগে বল্লে, তুমি কি আমাকে এমনি করে ভাসিয়ে দেবে বলে বিয়ে করেছিলে ? যার স্ত্রীর ভার নেবার সঙ্গতি নাই, যে শুধু মায়ের মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার আবার বিয়ে করা কেন ? বাবা, এ পাড়াগাঁয়ে কি মানুষ থাক্‌তে পারে!

বলিতে বলিতে নীলমণির চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নীহারের মুখখানা শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল, সে মলিন মুখে বলিল, বৌ-মা ত আমার তেমন মেয়ে নয়। আর কলকাতাতেই যদি থাকতে চায় তাই নিয়ে যা না বাবা! আমি তোকে টাকা দিচ্চি, তারপর সেখানে গিয়ে একটা চাকরির ঠিক করে নিবি। বৌ-মা এখন ছেলেমানুষ কিনা তাই ওরকম বলে।

তাই বলে, তোমার উপর কথা বলবে, যা তা বলবে ?

বলিতে বলিতে নীলমণির চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিল।

নীহার বলিল, ওরে বোকা, তোকে না বল্লে কাকে বলবে সে, তুইও যে পাগল হলি দেখ্‌চি।

ও: আমি তার কথা শুনে তাকে কলকাতায় নিয়ে যাই নি, তোমায় অবজ্ঞা করতে শিখি নি তাই পাগল, নয় ?

কেন, আমায় অবজ্ঞা করতে ত সে বলে নি। আর কলকাতা যাওয়ার কথা, তা একটা ভাল দিন দেখে নিয়ে যা না তাই।

কি, কলকাতা নিয়ে যাবো ?

হাঁ, তা যাবিনি ?

যাব না কেন, তোমার কথা কখন শুনি নি, যে দিন বলবে সেই দিন সেই দণ্ডেই নিয়ে যাবো।

যদি একান্তই কষ্ট হয় এখানে তা হ'লে কি ক'রবি ?

কেন কলকাতা নিয়ে যাবো ?

রাগ করিস নি বাবা, আমি কিছু মন্দ বলছি না।

মন্দ ত কোন দিনই ব'ল নি, রাগ করবো কেন, কালই নিয়ে যাবো।

বলিয়া নীলমণি গৃহের বাহির লইয়া গেল। নীহার এই একরোখা পাগল ছেলেটাকে ভাল করিয়াই জানিত। সে একবার যাহা করিব বলে তাহা না করিয়া ছাড়ে না। নীহার ভাবিল, সত্যই যদি খোকা কলিকাতা চলিয়া যায়, তবে ? মনে হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু আসিয়া তাহার চোখের কোণে দাঁড়াইল, সে অঞ্চলে চোখ মুছিয়া গৃহকার্য্যে মন দিল।

হ্যাঁ গা, এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, আর খোকা কলকাতা গিয়ে একখানা পত্র দিলে না !

বোধ হয় বৌমা বারণ করেচে।

তা যদি বারণই করে, তা বলে খোকা তার বারণ শুনবে !

তা শুনবে না !

নীহারের দু'চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া গেল, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ওঃ! খোকা যে এমন ভুলে যাবে তা আমি কখনও ভাবি নি।

ভোলে নি গো, সে যে শুধু তোমার উপর অভিমান করে পত্র দেয় নি তা বুঝতে পারো না !

নীহার একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল, কথায় আছে, গুরু বাক্য না শোনে কানে দুঃখ পায় নানা স্থানে ; আমার তাই হ'ল, তোমার কথা না শুনে ভাল কাজ করি নি। খোকারও একান্ত অনিচ্ছা ছিল। আমার কপালে দুঃখ রয়েচে তা না হ'লে ওখানে বিয়ে দেবার আমার অমন জেদ হ'বে কেন। হ্যাঁ গা, যে খোকার মা-অন্ত প্রাণ ছিল, একদণ্ড আমায় দেখতে না পেলে চীৎকার করে বাড়ীখানা মাথায় কত্তো আর সেই খোকা যে এমন নিষ্ঠুর হ'বে তা ভাবিনি।

বলিতে বলিতে নীহার কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজ বলিল, তার জন্য কাঁদতে হবে কেন তোমায় ?

নীহার ধরা-গলায় চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি যে তাকে অনেক আশায় এতটুকু থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি গো।

বলিতে বলিতে আবার নীহার কাঁদিয়া ফেলিল। সরোজ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, মানুষ করলেই যে তার উপর তোমার চিরদিনের দাবী করবে এমন ত কোন কথা নেই নীহার। তোমার পেটের ছেলে নেই তাকে যত্নআত্তি করে সুখ পেয়েচ এই তোমার লাভ।

নীহার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল, আমি তাকে আমার কেনা হয়ে ত থাকতে বলি নি। তা বলে সে কলকাতা গিয়ে একখানা পত্র দিলে না। খোকা ত আমার এমন ছিল না, আমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি।

এখন আর সে দুঃখ করে কি করবে বল।

নীহার নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

আজ যে তোমার খোকার খবর এসেচে গো।

বলিতে বলিতে সরোজ আসিয়া নীহারের কাছে দাঁড়াইল। খোকার খবর আসিয়াছে শুনিয়া নীহারের অভিমান বাড়িয়া গেল, সে তর্জ্জন সহকারে বলিল, ধন্যি যা হোক তুমি, একদণ্ড তাকে ভুলতে পার নি ? হ্যাঁ গা তাকে এত করে মানুষ করলুম আর এখন তাকে একখানা পত্র লিখলে উত্তর দেয় না, তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি ? আমি সত্যি বলছি, খোকাকে আমি মন থেকে মুছে ফেলেছি।

বলিতে বলিতে নীহারের গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সরোজ বলিল, তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেচ ; কিন্তু আমি এখনও যে পারি নি নীহার ! আজই আমার কলকাতা যেতে হবে, তাকে যে এ অবস্থায়—

নীহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, কি অবস্থা, কি হ'য়েছে তার ?

সে জ্বরে আজ ৮১০ দিন ভুগ্‌চে, বৌমা ডাক্তার দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে কোন মতে ডাক্তারকে বাড়ীতে আস্‌তে দেয় নি, বলেচে, ডাক্তার ডাকলেই আমি আত্মহত্যা হব। বৌ-মা দিনরাত কাঁদচে, তাই খোকার এক বন্ধু আমায় পত্র লিখেচে।

নীহার চোখের জল মুছিয়া শঙ্কিত মুখে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া এবং পরক্ষণেই অভিমান জড়িত কণ্ঠে বলিল, তা তুমি গিয়ে কি করবে?

কি করব কি গো, এ অবস্থায় না গিয়ে থাক্‌ব কেমন করে। আজ যদি তার রোগ বেড়ে গিয়ে—

অকস্মাৎ নীহার দুই হাতে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোন কথাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুক্ষণ পরে নীহার সংযত হইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, না আমায় সুদ্ধো আজই নিয়ে চল তুমি, আর আমি খোকাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না। সে কঠিন হ'য়ে থাক্‌লেও, আমি আর একদণ্ড শক্ত হয়ে থাক্‌তে পারি না।

তাঁর জন্ত তোমায় কাঁদতে হ'বে না, আজই তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কচ্চি।

যদি খোকা ওষুধ না খায়, যদি সে আমার সঙ্গে কথা না কয়!

বলিতে বলিতে নীহারের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে বার বার অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল।

সরোজ বলিল, হাজার শক্ত হোক্ সে, আমার কথা কাটাতে কিছুতেই পারবে না।

নীহারের বুক খালি করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

বারাণ্ডা হইতে ছুটিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রমীলা স্বামীর শিয়রে গিয়া বসিল, এবং একবার তাহার মাথার উপর আস্তে আস্তে হাতখানি বুলাইয়া দিল। হস্ত স্পর্শে নীলমণি একবার তাকাইল মাত্র, কোন কথা কহিল না। প্রমীলা বলিল, মা আস্‌ছেন যে, সদর দরজায় তাঁকে আস্‌তে দেখে এলুম।

হুঁ। বলিয়া নীলমণি পাশ ফিরিয়া শুইল; কিন্তু মা আসিতেছে শুনিয়া অভিমানে তাহার দু'চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

নীহার বাড়ীতে প্রবেশ করিবা মাত্র প্রমীলা গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া আসিল। নীহার নীলমণিকে লক্ষ্য করিয়াই মুহ্যমান ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ তাহার দুর্ব্বল শরীর লক্ষ্য করিয়া তাহার দু'চোখ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে নীলমণির শিয়রে বসিয়া ডাকিল, খোকা!

নীলমণি কোন উত্তর দিতে পারিল না।

নীহার পুনরায় ডাকিল, খোকা! বাবা আমার—

নীলমণি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, হুঁ—আর কিছুই বলিতে পারিল না।

নীহার বলিল, হাঁরে খোকা, তোর কি এতটুকুও মায়া মমতা নেই?

নীলমণি দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, যখন তোমার মতন মায়ের ছেলে আমি, তখন মায়া মমতা না থাকাই সম্ভব।

হ্যাঁ রে, এমন ধারা সব কথা কবে থেকে শিখ্‌লি তুই?

যবে থেকে তুমি শিখিয়েচ, যবে তুমি বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েচ।

বলিতে বলিতে নীলমণি কাঁদিয়া ফেলিল। নীহার তাহার চক্ষুদ্বয় মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, বাড়ী হ'তে আবার দূর কল্লুম কবে রে?

নীলমণি মায়ের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিছুই বলিতে পারিল না। নীহার বলিল, বৌ-মা, বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখ ত বাছা, ডাক্তার নিয়ে উনি আস্‌ছেন কিনা।

প্রমীলা বারাণ্ডায় বাহির হইয়া গেল। নীলমণি বলিল, ডাক্তার ডাকতে হ'বে না, আমি ওষুধ খাব না।

হ্যাঁ রে তোর কি এতদিনেও পাগলামী গেল না। ওষুধ না খেলে ভাল হ'বি কি করে?

আমি আর ভাল হ'তে চাইনি, তুমি প্রাণ খুলে বল মা আমি যেন—

নীহার নীলমণির মাথাটা আরো একটু কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি বল্লি, ওষুধ খাবি না? তবে আর আমার এ জীবন রেখে কি ফল বাবা, আমিও বরং—

মুহূর্ত্তের মধ্যে নীলমণির অভিমানের বাঁধন আলগা হইয়া গেল, সে মাতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, ক্ষমা কর মা, এবার যা বলবে, তাই শুনবো, কক্ষনো তোমার অবাধ্য হ'ব না মা!

মা—মা—

নীহারের দুই ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু নীলমণির গালের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ধর্ম্মঘট

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চামারের ছেলে চাম্‌ড়া ছোঁবে না,
কসাই ছেড়েছে ছুরি;
মুটে মোটে আর মোট্‌ বহিবে না—
নামায়ে রেখেছে ঝুড়ি।

অথই অথির দক্ষিণা-ভরা
আজিকে দক্ষিণায়,
ধূলা ঝেড়ে ফেলে গাও মেলে দিয়ে
মজুর জুড়াতে চায়।

গাড়োয়ান আর গাড়ী হাঁকাবে না,
শস্য নেবেনা হাটে;
অশথের তলে গাঢ় চোখ মেলে
গরুরা জাবর কাটে।

জাহাজ আজিকে বেজান্ হয়েছে,—
মাস্তুল চৌচির ;
ভিড় লেগে গেছে সাগরের তীরে
খালি-গায়ে খালাসীর ।

হাল আর হল হয়েছে বিকল ;
কলু আর কালো কুলি
আজ দখিণায় ঘেঁষে গায়-গায়
করিতেছে কোলাকুলি ।

ঝাড়ুদার-ঝি'র লজ্জা হয়েছে
চালাবেনা পথে ঝাড়ু ;
একেলা বসিয়া পারুলের ফুলে
বানায় পায়ের খাড়ু ।

হাতের সঙ্গে হাতুড়ি থেমেছে,
ছুতোর করেছে ছুতো ;
হঠাৎ তাঁতির তাঁত ছিঁড়ে গেছে
ফুরায়ে গিয়েছে সূতো ।

কাৎরানি এত কের্‌দানি যার
সে কল হয়েছে কাৎ
আজি দখিনায় মজুর জুড়ায়,
আজিকে সুপ্রভাত !

কেরাণীরা সব কলম ছুঁড়েছে,
উপুড় করেছে কালি ;
আকাশ আজিকে চায় তার চোখে
জ্যোৎস্না-জোনাকি জ্বালি ।

ফিরিওয়ালারা আর ফিরিবেনা
ঠাঠা-পড়া চড়া রোদে ;
ধাঙড় আজিকে নোঙড় নিয়েছে,
মুদি সে নয়ন মোদে।

কেরাণীর রাণী উনুনের কোণে
ঠেলিবেনা আর হাঁড়ি ;
আজ দখিনায় খোঁপা খসে' যায়,
গোছালো থাকেনা শাড়ী।

বস্তা যাহারা বয় আর যারা
বস্তিতে বাস করে,
খোলা রাস্তায় ভরা দখিনায়
নিশ্বাস আজি ভরে।

দখিনার ফুঁয়ে গিয়াছে উড়িয়া
কবাটের ছেঁড়া চট্ ;
আকাশে বাজিছে ছুটির ঘণ্টা,
আজিকে ধর্ম্মঘট।

আমরা ও তাঁহারা

চতুর্থ স্তবক

স্ত্রী-পুরুষ

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লেখকের 'আমরা ও তাঁহারা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি এতদিন ধরিয়া "বঙ্গবাণী" পত্রিকাতেই ছাপা হইতেছিল। কিন্তু এই লেখাটি একটু ঝাঁঝালো, বোধ হয় সেই কারণেই তিনি 'কল্লোল'-এ ইহা ছাপিতে পাঠাইয়াছেন। হয় ত ভয় ছিল, 'বঙ্গবাণী' এরূপ লেখা নাও ছাপিতে পারেন। লেখক বিদ্বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁহার এরূপ মত প্রকাশ করিবার ভিতর নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্য আছে। পড়িয়া দেখিলাম, যদিও লেখাটিতে স্ত্রী-সাম্যের বিরুদ্ধে বাহত কতকগুলি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি ইহার ভিতরকার মর্ম্মটি একটু সহানুভূতি লইয়া পড়িলেই ধরা পড়ে।

মেয়েদের প্রেমে পড়িবার স্বাধীনতা দিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা বিবাহ করিবার জন্য অত ব্যগ্র হইবেন না, অতএব জীবনে আশাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রভৃতি মিথ্যা 'ধয়তাই বুলির' হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। প্রেম একটি বহমান শক্তি, সাম্য একটি অবস্থা মাত্র, অধিকার নয়। শক্তির হ্রাসের পরই গতি রুদ্ধ হয়, এই রুদ্ধ গতির নাম বিবাহ। বিবাহে পুরুষ সত্তা লোপ পায়, জড় প্রকৃতি জয় লাভ করে। স্ত্রীজাতি বলিতে স্ত্রী-প্রকৃতি, অর্থাৎ—জড়ত্ব বুঝা যায়। প্রেম ও সাম্য—পরস্পর দুইটি ভিন্ন ভাব প্রকাশক শব্দ।

বোধ হয় লেখক এইরূপ ভাবই লেখাটিতে প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আশা করি পাঠকপাঠিকাবর্গ এই লেখাটি কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধাজনিত অভিমত বলিয়া মনে করিবেন না।—সম্পাদক।

আমার কাছে বক্তৃতার অনেক বিষয় জমা আছে, এই খবরটি দেওয়াতে নেহাৎ বোকামীর পরিচয় দিই নি মনে হচ্ছে। অনেকে আমার বাড়ী পদধূলি দিচ্ছেন। স্বদেশী যুগ এবং বিশেষতঃ অ-সহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে সন্দেহ কোরেছিলাম যে, মানুষের বক্তৃতা শোনবার স্পৃহা তার তর্ক করবার শক্তির চেয়ে বেশী প্রবল, আজকাল সে সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। নিজের আওয়াজ নিজের কানে ভাল লাগাই কানের ধর্ম্ম, কিন্তু অন্যের আওয়াজ যে কেন ভাল লাগে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাই না। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, সেকালে ভাষা সকলের সম্মিলিত চেষ্টার প্রথম ফল, তখন ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা আদিম ও দৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং সামাজিক সহানুভূতি কিম্বা আত্মীয়তার প্রকৃষ্ট বিকাশ। অন্য কারণ এই হতে পারে যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতেও অনুকরণশীলতা, অর্থাৎ গড্ডলিকা-প্রবৃত্তি, অসংখ্য ব্যক্তিত্ব উন্মেষণকারী মন্ত্র, তন্ত্র ও যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রবল রয়েছে, এবং সেই জন্য মানুষ অন্যের কাছে বক্তৃতা শুনতে যায়। আমার ক্ষেত্রে একটি কারণ হয় ত এই হতে পারে যে, আমার শ্রোতৃবৃন্দ হাতের কাছে সুবিধাজনক পরিহাসের বিষয় না পেয়ে আমাকে নাচাতে আসেন। আমি কথা কইতে ভাল বাসি এবং বেশী কথা কই। যে বেশী কথা কয় সে সব সময় বুদ্ধিমানের মতন কথা কয় না, তাই হয় ত আমার বন্ধুরা আমাকে অনর্গল বক্তৃতা দেবার অবকাশ দিয়ে নিজেদের গাম্ভীর্য্য ও বরিষ্ঠতা প্রমাণ কোরতে আসেন। কিন্তু তাও কি সম্ভব? মৌনীবাবা হলে সাধারণের সুবিধা হতে পারে কিন্তু বন্ধুরা ত কেউ সাধন কোরছেন বোলে মনে হয় না।

বন্ধুত্ব মানে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা গ্রাহ্য করবার সুযোগই বুঝি। বন্ধুরা তর্কাবসানে যখন বাড়ী ফেরেন, তখন একলা

শুয়ে, চক্ষুমুদ্রিত কোরে, তাঁদের তৈলঙ্গ স্বামী মনে ক'রে আমার হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হয় না, বরঞ্চ তাঁদের অবর্ত্তমানে আমার তর্কবুদ্ধি কূটতর হয়, তাঁদের আপত্তির খণ্ডন এবং প্রশ্নের নতুন নতুন উত্তর মাথায় গজ্ গজ্ করে। কি করে বিশ্বাস করি যে, তাঁরা ঝাড়া দুই তিন ঘণ্টা আত্মগোপন করে আমাকে বোকা বানিয়ে বাড়ী গিয়ে বিছানায় শুয়ে পান চিবুতে চিবুতে নিজেদের শ্রেষ্ঠতার তারিফ কোরতে কোরতে ঘুমিয়ে পড়বেন, অথচ আমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারব না কিম্বা তাঁরা আমাকে বুঝতে দেবেন না যে, আমি কত বড় বোকা? আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমি বোকা নই। অনেকেরই নিজেদের সম্বন্ধে ঐ বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—এই হচ্ছে তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের তফাৎ। এই তুলনামূলক বিচার করা ভারী শক্ত ও গোলমেলে কাজ। কি জানি! আমি যদি বোকাই হই এবং নাচবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকি, তা হলে দেখছি মেলামেশা, কথাবার্ত্তা কওয়া দায় হল! কেউ যে আমার কাছে উপকৃত হতে আসেন বিশ্বাস হয় না।

এই প্রত্যেক ব্যবহারের গূঢ় কারণ খোঁজা আমার এক পেশা হয়ে উঠেছে। কারণ-বাহির করা একটা নেশা, পেশা নয়, ওটা রোগ, এই বর্ত্তমান সভ্যতার একটা মস্ত বড় ব্যাধি। Jesting Pilate এই ব্যাধির বীজাণু প্রথমে পশ্চিমে ছড়ান, তার পর দুই 'বেকন'-এ মিলে ঐ বীজাণুকে পাটি কোরলে, তার পর হ্যামলেট, ভলটেয়ার, বাজারভ্ নিজেরা পীড়াক্রান্ত হয়ে দেশময় বীজাণু ছড়িয়ে দিলে—এখন বিজ্ঞান গণতন্ত্র ও ছাপাখানার যুগে রোগটি মহামারী হয়ে উঠেছে—কারুর অব্যাহতি নেই। এখন self না থেকেও প্রত্যেকে self-conscious হয়েছে। তা হলেও রক্ষা ছিল; ফ্রয়েড, ইয়ং এবং পরদেশী সাহিত্যের জ্বালায় সকলে sex-conscious হয়ে পড়েছি। নিজের এবং পরের সহজ সরল আস্ত ব্যবহারকে চুল চিরে বিশ্লেষণ কোরে মানুষ কতদূর উচ্ছন্ন যেতে পারে, ফরাসী সাহিত্যে তার প্রমাণ রয়েছে। সেখানে আর প্রেম, হিংসা, লোভ, মোহ, প্রকৃতিপূজা কিছুই নেই, ফরাসী নভেল নাটকে গল্পাংশ লোপ পেয়েছে। আছে শুধু enumi, boredom, কিছুই ভাল লাগে না, 'প্রাণ করে আইঢাই' ভাব, সুন্দর চলে যাবার পর বিদ্যার যে দুর্দ্দশা হয়েছিল। Marcet Proust কি Paul Bourget, এই finde seicle mood-টি পরিস্ফুট কোরেছেন বলেই তাঁরা সত্যকারের ফরাসী লেখক বলে গণ্য হন, আর রম্যাঁ রঁলাকে আদর্শবাদী, ভাবপ্রবণ প্রগলভ জর্ম্মাণ বলা হয়। যদিও জর্ম্মাণ সাহিত্যেও ঐ এক রোগ! Schnitzler-এর Home Coming of Casanova পড়া যায় না। অতিবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ফলে প্রেম কামে পরিণত হয়—যেমন ফ্রয়েড্, এই যেমন গৌর-বিল এবং ব্রাহ্ম কি বিলাত-ফেরৎ সমাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অতিবুদ্ধিমান ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ-সভার মতামত—কৃতজ্ঞতা হয়ে উঠে স্বার্থপর খোসামুদী, আর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার হয় ইকনমিক্স,—অর্থাৎ বড়-লোক ও গরীব লোকের ঝগড়া। বিলেতে কি হাওয়া বইছে জেনে লাভ নেই, কেন না ওরা নীলকণ্ঠ, ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয় না, হেরে গিয়ে জিতে যায়, প্রেমে পড়ে বিবাহ করে না, পাগল হয়ে সেরে যায় এবং অতিবুদ্ধির বিপক্ষে anti-intellectualism প্রচার করে। আমরা অন্য ধাতের—পুঁই শাক চড়চড়ী, কাদা চিংড়ী খেয়ে মানুষ, আমাদের ঘোড়া-রোগ সাজে না। আমার নাম ধূর্জ্জটী হলেও আমি নীলকণ্ঠ নই, সেই জন্য আর কোন বন্ধুর সরল সহজ ব্যবহারকে মন্থন কোরে বিষ বার কোরতে চাই না। যে লোক নেশা মাথায় চড়ে যাবার ভয়ে কোন দিন পরের পয়সাতেও নেশাটি পর্য্যন্ত কোরতে সাহসী হল না, তার বিশ্লেষণে কাজ নেই। শেষে কি হ্যামলেট, বড়লেয়ারে দুর্দ্দশা হবে? সরল ভাবে ধরে নিই, বন্ধুরা আত্মোন্নতির জন্যই আমার কাছে বক্তৃতা শুনতে আসেন। তাঁরা যে দাম্ভিক এ অনুমান করবার অধিকার আমার কি আছে? মানুষ নিজের খেয়ালে কাজ করে যাবে, কারণ অন্যে খুঁজবে, যাদের পেশাই

হচ্ছে প্রত্যেক কাজ, অ-কাজ এবং কুকাজের কারণ খোঁজা। বার্গসনের মতে, মানুষ সামনে চোখ রেখে, এমন কি চোখ বুজেও পথ চলে। সেই যে ছেলেবেলা বুড়ো-ঝির কাছে ভুতের গল্প শুনেছিলাম—'ভাঁটার মতন চোখ দুটো তার, পিছন দিকে পা'—সেই ভুতের মতন হওয়া কোন মানুষের ভবিষ্যৎ হতে পারে না। সামনেই চলতে হবে।

* * *

আজ বন্ধুরা এসে প্রশ্ন কোরলেন, আচ্ছা মশাই, কথায় কথায় আপনি স্ত্রী-জাতিকে অত ঠাট্টা করেন কেন বলুন দেখি?

আমি—আমার উত্তর তাঁদের দেবো। আপনারা তাঁহারা নন্।

তাঁহারা—না হতে পারি, কিন্তু আমাদের মা, বোন্ স্ত্রী সকলেই স্ত্রী-জাতির অন্তর্ভুক্ত।

আমি—আমিও কিছু ম্যাক্‌ডাফ্ নই, আমার সব আত্মীয়ারাই স্ত্রীলোক। আচ্ছা, আপনাদের কাছেই উত্তর দিচ্ছি, কেন না ভগবান পৃথিবীতে দুই জাতির মানব সৃষ্টি কোরেছেন—এক স্ত্রী, অন্য স্ত্রী-ভক্ত পুরুষ।

তাঁহারা—বাজে ইয়ারকী ছেড়ে দিন, সত্য কথা বলুন।

আমি—এখানে মিথ্যা কোথায় পেলেন? সত্য কথা বোলতে কি, সত্য কথা বলা একেবারে অসম্ভব, যদি সত্য কথা সহ্য করবার জন্য মনোভাবটি তৈরী না থাকে। আমি আপনাদের স্ত্রীলোক বোলেই মেনে নিচ্ছি, অবশ্য পুরুষ ভাবলেও চল্‌ত, এবং আপনারা দয়া কোরে মেনে নিন্ যে, আমার মন্তব্যগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। কেইসারলিঙ্ একখানি বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক লিখেছেন, বার্ণার্ড্ শ'কে সে পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য লিখতে অনুরোধ করা হয়। তিনি কি লিখেছেন শুনুন—

"No man dare write the truth about marriage while his wife lives. Unless, that is, he hates her, like Strindberg; and I don't." অর্থাৎ স্ত্রী বেঁচে থাকতে বিবাহ সম্বন্ধে কিছু লেখা দুঃসাহসের কাজ এবং অন্যায়।

তাঁহারা—তবে এ অন্যায় করেন কেন?

আমি—কি জানেন, স্ত্রী এক বস্তু এবং স্ত্রীজাতি অন্য জিনিষ। সমস্ত জাতির মধ্যে মাত্র একটি ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধই হচ্ছে বিবাহ, সেই বিবাহের দুই তিন বছরের পর মতামতই হচ্ছে স্ত্রী-বিদ্বেষ এবং বিবাহ আরো কিছু পুরাতন হবার পরই স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলই বিবাহ-বিদ্বেষ। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মতামত সবই সময়-সাপেক্ষ—function of time.

তাঁহারা—আপনার ক'বছর বিবাহ হয়েছে?

আমি—ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দিতে রাজী নই। আমাকে সাধারণের পংক্তিতে ফেলে অপমান কোরবেন না। আমি বিবাহ-বিদ্বেষীও নই, স্ত্রী-বিদ্বেষীও নই।

তাঁহারা—আপনি যেকালে অ-সাধারণ, তখন অত ভয় করবার কারণ নেই। সেদিন 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় পড়ছিলাম যে, অসুখী বিবাহিত জীবনেই যা-কিছু বড় কাজ করা যায়, শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবনে আত্মোন্নতি অসম্ভব, এমন কি বড় বড় লোক সব অসুখী পিতামাতারই সন্তান। এ সিদ্ধান্তগুলি আপনারই কেইসারলিঙ্-এর। অবশ্য আমরা তাঁর বইখানি পড়ি নি। আপনি একবার বইখানি ধার দিতে পারেন?

আমি—বইখানি আমার নেই, আমিও পড়ি নি, আমিও ষ্টেটসম্যানে পড়ছিলাম। কি জানেন, এমার্সন বোলেছেন, সব উদ্ধৃত বাক্যই দুই তিন মুখ ফেরৎ। আমরা অধ্যাপক, নিজের বিষয় কত বই লেখা হচ্ছে তাই পড়ে উঠতে পারি না—এমার্সন—

তাঁহারা—আপনার বিনয়ে আমরা মুগ্ধ কিন্তু এমার্সনের নাম কোরলেন কেন? বেশ প্রাণ খুলে গুপ্ত-কথা আলোচনা কোরতে এসেছিলাম, সহ্য হল না বুঝি! আপনিও দেখছি Puritan হলেন!

আমি—ফরাসীরা পর্য্যন্ত Puritan হয়ে পড়ছে—Mont Parnasse-র নতুন দল সব যোগী সন্ন্যাসী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা এত বাড়াবাড়ি করছেন যে, Duhamel

তাঁদের ঠাট্টা পর্য্যন্ত আরম্ভ কোরে দিয়েছেন শুনছি। ইংলণ্ডেও আপনাদের বার্ণার্ড্ শ' মস্ত বড় Puritan. যেকালে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যা হচ্ছে তাই আমরা বিশ পঁচিশ বছর পর নকল করি তখন না হয় আমি কিছু দিন আগে থাকতেই নকল কোরে একটু বাহাদুরী নিলাম: Adaptibility আর Imitation-এ তফাৎ যা ঐ সময়ে।

তাঁহারা—এখন বলুন কেন আপনার কথায় লেখায় স্ত্রী-বিদ্বেষ অত ফুটে ওঠে? আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আপনার মতামত কথার কথা, জীবনের কথা নয়।

আমি—সে কি! জীবনের কথা নিশ্চয়ই, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই জীবনের কথা, তবে আমার জীবনের কথা নয়, কেন না মতামতগুলি প্রত্যেক সত্যবাদীর জীবনের কথা, অর্থাৎ কারুর ব্যক্তিগত কথা নয়, এইটুকু মানলেই সন্তুষ্ট হব। জীবন ও ব্যক্তিত্ব এক নয়। অ-বাস্তব মন্তব্য হোতে পারে না কি?

তাঁহারা—কিছুতেই হোতে পারে না। মানুষ ছাড়া ভাবা আমাদের মতন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে শক্ত।

আমি—একটু বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখুন। সূর্য্য চন্দ্র কি আপনার জন্যই ঘোরে? আপনারা অনেকেই ত হিসাব বিভাগে কাজ করেন, কোটি কোটি টাকার হিসাব রাখেন, কিন্তু টাকা ত আপনাদের নয় জানেন। আমরা প্রত্যেকেই চিনির বলদ নই কি? যে যত abstract ভাবে কথা কইতে পারে সে-ই তত শিক্ষিত এবং সভ্য, এইখানেই বোঁৎ ভুল কোরেছেন। বিজ্ঞানের যুগ সভ্যতার শেষ অবস্থা হতে পারে, কিন্তু Positive-Concrete-যুগ অসভ্যের অবস্থা। বিজ্ঞানও ত আমাদের abstract ভাবে কথা কইতে শেখাচ্ছে—প্রেমের, বুদ্ধির, সভ্যতার সব আঙ্কিক অনুপাত কষা হয়ে গিয়েছে, জানেন না?

তাঁহারা—সবই জানি। কিন্তু জেনে শুনে কিছু বুঝতে পারি না, সবই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অবশ্য আমাদের মাথার মধ্যে সবই ফাঁকা ফাঁকা বোলেই বোধ হয়। একটু দয়া কোরে সহজভাবেই বুঝিয়ে দিন না।

আমি—তা বেশ, চেষ্টা করছি। তবে আপনাদের মাথা সব খালি নয় জেনে রাখুন, আমার নাক আমার কানের মতই সজাগ। সোজা কোরেই বলছি, এই যেমন আদুরে ছেলে—spoilt child-ই আবদারে ও cynical হয়, তেমনি আদুরে স্বামীই হয় Misogamist,—বিবাহ-বিদ্বেষী এবং আদর্শ নায়কই Misogynist, স্ত্রী-বিদ্বেষী। বুঝেছেন? আচ্ছা উল্টো কোরে দেখুন আরো ভাল বুঝবেন—কোন নায়কের দ্বারা উপেক্ষিতা কিম্বা স্ত্রৈন স্বামীর শিক্ষিতা রমণীই স্ত্রী-স্বাধীনতা ও সাম্যের মুখপাত্রী হয়ে ওঠেন মনে হয় না কি? দেখুন বেশী আদর পেয়েই, অনাদর পেয়ে নয়, আমার অন্ততঃ আবদার বেড়ে গিয়েছে। তাই অন্য বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক আমাকে যখন আমার মা'র মতন স্নেহ না করেন, কিম্বা ভগ্নীর মতন আদর যত্ন না করেন, তখন যাই চটে।

তাঁহারা—সে যাক্, বিশ্লেষণের গুণ দাম্ভিকতার দোষ কখনও ঢাকতে পারে না।

আমি—আমি বিশ্লেষণ কোরে নিজের মনোভাবটি কি উপায়ে উৎপন্ন হল তাই দেখাচ্ছি। ব্যবহারকে আমি বিশ্লেষণ করিনি। আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য কোরেছেন যে, মুখে আমি এক কথা বলি, ব্যবহারে অন্য কাজ করি।

তাঁহারা—দ্বৈতাচরণ ত অধ্যাপকদের একচেটে ব্যবসা। হাঁ, আপনাকে আমরা ladies' man বোলেই জানি। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোরতেই ত এলাম। আপনি অত্যন্ত chivalrous, মধ্যযুগের knights-দের মতনই।

আমি—ঠিক বোলেছেন এবং ভাল বোলেছেন। মার্ক টোয়েন একবার একটি আমেরিকানকে রাজা আর্থারের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। আহা! মধ্যযুগের বর্ণনা একমাত্র মার্ক টোয়েনই কোরেছেন, মারলো নয়, টেনিসনও নয়! দেখুন মধ্যযুগের chivalry হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারি, কেন না উক্ত ব্যবহারের পিছনে 'আছে, 'আহা অবলা কি ভবলা' মনোভাবটি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের সাম্যভাব কি স্বাধীনতা বুঝি না। আমি একবার মেয়েদের সভায় উপস্থিত ছিলাম, অন্য পুরুষও ছিলেন অবশ্য। সে সভায় বড় বড় মহারথী এবং বিস্তর শিক্ষিতা মহিলা

স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং সাম্য নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমি একটি কোণে চেয়ারে বোসেছিলাম এবং ভাবছিলাম রং বেরং-এর সাড়ী জহরলাল পান্নালাল দেশে এনেছে বটে কিন্তু রূপ আনতে পারেনি। হঠাৎ একজন মহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন—হতভাগ্য আমি, আমি ছিলাম অন্যমনস্ক, আমার দিবাস্বপ্ন থেকে আমি জেগে উঠে তাঁকে স্থান দিতে ভুলে গেলাম। সমস্ত হল্ ভর্ত্তি, মহিলাটি খানিকক্ষণ দাঁড়াবার পর একেবারে মঞ্চে উঠলেন, সকলে খাতির কোরে তাঁকে সামনে জায়গা দিল। তাঁর পালা এলে তিনি বক্তৃতা সুরু করলেন। বক্তৃতাটি যেন শুনেছি শুনেছি মনে হল। মহিলাটি বক্তৃতা শেষ করলেন এই বলে, এখনও আমাদের দেশে, দেশে কেন, এই সভায় এমন পুরুষ আছেন যাঁরা কোন মহিলা বিপদে পড়লে রক্ষা করেন না, রক্ষা করা পর্য্যন্ত তাঁরা অসভ্যতা বিবেচনা করেন, একবার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠবার শক্তি বা ইচ্ছা পর্য্যন্ত তাঁদের নেই। যতদিন পুরুষ—না কাপুরুষ,—নারী-জাতিকে এই রকম অবহেলা ও অবমাননা কোরবে, ততদিন স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবাস্বপ্নই থাকবে। করতালিতে সভা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার মুখটি ম্লান হয়ে গেল, বেশ টের পেলাম।

তাঁহারা—আজকাল টাইপিষ্টদের মতন আরসী নিয়ে বেড়ান না কি? আপনারও অন্যায় হয়েছিল, উঠলেই পারতেন, পুরুষেত্বর মানহানি হত না।

আমি—মুখটি আমার কখন ম্লান হয় বেশ বুঝতে পারি। আমার সত্যই অন্যায় হয়েছিল, কেন না মহিলাটি একটু শাঁসে জলে পরিপূর্ণা ছিলেন। মহিলাদের কেমন একটি Intuition আছে, আমি যে অন্যমনস্ক ভাবে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তবে তাঁদের Intuition-এর একটি মাত্র দোষ এই যে, তার সাহায্যে তাঁরা ভুল সিদ্ধান্তেই পৌছান্। আমি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছিলাম না, আমি ভাবছিলাম সাড়ীর কথা, দামী সাড়ীর সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ কি, এবং স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেই জহরলাল পান্নালাল ও বৈকুণ্ঠ শুঁই-এর দোকান তুলে দেবার কথা। অবশ্য বক্তৃতা শোনবার পর মনে হয়েছিল সাড়ীর দোকানই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়।

তাঁহারা—তাহলে তাঁর বক্তৃতা শুনে ত খুব বড় বড় তথ্য আবিষ্কার কোরেছিলেন দেখছি!

আমি—দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবা আমি অন্যায় বিবেচনা করি না। মহিলাদের বক্তৃতা, অর্থাৎ একটি সভাপতি, স্ত্রীভক্ত পুরুষটির বক্তৃতা, অর্থাৎ John Stuart Mill-এর বিখ্যাত প্রবন্ধের বাংলা তর্জ্জমা শুনে আমার কিন্তু সন্দেহ হল যে, মেয়েরা কি চাচ্ছেন পুরুষেরা জানে না, এবং মেয়েরাও জানেন না, কিম্বা মেয়েরা ভাল রকমই জানেন এবং জেনে, স্বভাব অনুসারে প্রকাশ কোরছেন না, এবং পুরুষেরাও জেনে দিতে পারবেন না ভেবেই মেয়েদের mislead কোরছেন। আরো সন্দেহ হল যে, খুব সম্ভবতঃ মেয়েরা চাইছেন মনে মনে একটি, মুখে বোলছেন অন্যটি। তখন আমার বিশ্বাস হল, মেয়েরা চান্ শুধু chivalry, তাঁহারা অত্যন্ত সুস্থ কিম্বা অত্যন্ত অসুস্থ বোলে, ধরা যাক অসুস্থ বোলেই। মধ্যযুগে chivalry সম্ভব হল কেন? সে সময় মেয়েরা অত্যন্ত রোগা ছিলেন,—প্রমাণ, ফ্রান্সিয়া, ফ্রালিপ্পি, ফ্রা-আঞ্জেলিকো, বটিচেলীর ছবিতে, বার্ণাজানস্ রসেটির ছবিতে মেয়েরা সব হাওয়ায় উড়ছেন, তাঁদের মুখের রং সব ফাঁকাসে। Renaissance-এর সময় থেকেই মেয়েরা পুরুষ্টু হলেন, তাঁদের চারিধারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেবদূত কি মর্ত্ত্যদূত আর রইল না। টিসিয়ান জর্জ্জিয়ানের ছবিতে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য রয়েছে। তার পর ফরাসী Watteau, Nattier, Boucher-এর ছবিতে স্ত্রীর পিছনে দাসী আর পায়ের তলায় পুরুষ। মেয়েরা না খেটে স্বাস্থ্য খারাপ কোরে ফেলুলেন। সংসারের কাজের জন্য দাসী থাকলে, অর্থাৎ বিলাসিনী হলে, ঘরের লক্ষ্মী কেবল মাত্র বিলাসের বস্তু হয়ে ওঠেন। বিলাসের বস্তু কাচের আলমারী এবং ফ্রেমের মধ্যেই শোভা পায়। বাংলা দেশের মেয়েদের অবশ্য ফ্রেমের মধ্যে প্রবেশাধিকার না থাকলেও তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের মৃগীরোগ আছে। পুরাতন সংস্কার অনুসারে তাঁরা হাসপাতালে যাবেন না,

সেখানে ভূতের ভয়, পুরুষ ডাক্তারের ভয়, দোক্তা পাওয়া যায় না, তাস খেলা যায় না যে। সেই জন্য তাঁরা চান্ ঘরে চেয়ারে, কৌচে, বোসে-শুয়ে, অসুস্থতা উপভোগ কোরতে, অর্থাৎ Chivalry উপভোগ কোরতে। হাতে অবশ্য নভেল থাকবে। পলিটিক্সে অল্প পেতে হলে বেশী চাইতে হয়, মেয়েরা বরাবরই diplomatic. সে যাই হোক—সেই সভায় যে সন্দেহ এবং বিশ্বাস হয়েছিল তা এখন লোপ পেয়েছে।

তাঁহারা—সন্দেহ দূর হল কি কোরে? লোপ পেলে কি কোরে? আশা করি যে উপায়ে আপনার অন্য বিশ্বাস লোপ পায়, অর্থাৎ বেশীদিন এক বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করবার অক্ষমতার জন্যই।

আমি—বাইরে থেকে দেখতে তাই বটে। আমার মনের দিক্ দিয়ে কিন্তু অন্য কারণে। সন্দেহ বলুন, দ্বন্দ্ব বলুন, সব থাকে যতদিন মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সোজা জিনিষকে শক্ত সমস্যা কোরে দেখে। আমি আর স্ত্রী-জাতিকে অধ্যাপকের মতন বুদ্ধি দিয়ে দেখি না, সাধারণ মানুষের মতন আমি তাঁদের প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করি। দুদিন পরে আত্মা দিয়ে দেখব, তখন পড়ব—বাবা আত্মারাম! আপাততঃ প্রাণই সব সন্দেহ, দ্বন্দ্বকে সমন্বয় কোরেছে, প্রাণের সাহায্যেই ভুল বিশ্বাস ও পুরুষালী দাম্ভিক সংস্কারগুলি অপহৃত হয়েছে।

তাঁহারা—তাঁদের সৌভাগ্য! কিন্তু আপনাকে ঠিক্ বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি বোধ হয় বোলছেন যে, তাঁদের শ্রদ্ধা করেন না, ভালবাসেন, অর্থাৎ অভ্যাসের বশে ভালবাসতে শিখেছেন।

আমি—আমার সোজা কথা বিশ্বাস না কোরলে নাচার। আমি অনেককে শ্রদ্ধা করি, অনেককে শ্রদ্ধা করি না, কিন্তু এমন স্ত্রীলোক দেখি না যাকে ভালবাসা যায় না। - অবশ্য কিছু অভ্যাস চাই স্বীকার করছি।

তাঁহারা—আপনি সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা আনতে চান তা হলে?

আমি—মোটেই না। আমি বোলেছি, 'না-ভালবাসা যায় না', ভালবাসি এ কথা বলি নি। এদেশের একজনকে ভালবাসার শক্তি নেই, আবার পঞ্চাশ জনকে! আমি বিশ্বাস এবং will to love-এর কথা বলছি। যে বিশ্বাস প্রাণেই উপলব্ধি করা যায় এবং যে ইচ্ছা প্রাণের মধ্যেই গুপ্ত থাকে।

তাঁহারা—আমাদের যতদূর মনে হচ্ছে, ওরকম বিশ্বাস ওরকম ইচ্ছা ডন্ কুইকসটেরই ছিল।

আমি—আজ আপনাদের হল কি? আপনাদের মুখে ফুলচন্দন্ পড়ুক! ডন্ কুইকসটই বর্ত্তমান সভ্যতার স্রষ্টা। এই যুগের তিনিই আদম। বাইবেলের আদমের সঙ্গে ডনের তফাৎ এই যে, সে আদম প্রত্যেক দেবদূতের বাণীকে ভগবানের আদেশ বোলে মেনে নিতেন, আর এ যুগের আদম ছাপার অক্ষরে যা ধরতাই বুলি লেখা থাকত তাই আদেশ বলে গ্রহণ করতেন। ফলভোগ দুজনেরই সমান হয়েছিল। আচ্ছা, সেই দৃশ্যটি মনে আছে? সেই Windmill-কে তাড়া করা? বর্ত্তমান যুগে অবশ্য আর কল কারখানার দৌরাত্ম্যে Windmill পাওয়া যায় না, সবই Windbag-এর আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেক Windbag-ই ধরতাই বুলিতে ভর্ত্তি। এই ধরুন, সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা কি স্ত্রী-পুরুষের কি আন্তর্জাতিক। স্বাধীনতা ধরতে গেলে একটা ধরতাই বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতার সত্তা এক স্বাধীন ব্যক্তিই বোঝে। জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীন কে? কিন্তু ফরাসী বিপ্লবই বেধে গেল ঐ তিনটি বুলি নিয়ে, কেন না ঐ সময় বুলি তৈরী করবার লোক এবং প্রচার করবার বক্তা ছিলেন। সেও আজ প্রায় দেড়শ বছর হতে চল্ল। আজ আর এমন লোক নেই যে নতুন বুলি সৃষ্টি করে চালাতে পারে কিম্বা লোক মাতাতে পারে। উড্রো উল্‌সনের কাছে অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু বেচারী চিরকাল মাষ্টারী করে অল্প কথা কইতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই বুলি তৈরী না করে বক্তৃতা ও বচন দিতে আরম্ভ করলেন। সেই জন্য দেড়শ বছরের পুরাতন বুলি এখনও চলছে, অথচ মনোভাব বদলে গিয়েছে, আচার ব্যবহার উল্টে গিয়েছে। আজকাল মাত্র সেই ব্যক্তিই নেতা হতে পারেন যাঁর বচন ও বুলি খবরের কাগজের হেড্ লাইনের

মতন সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত ছোট। গল্পও ছোট হয়েছে, নাটকও একাঙ্ক হয়েছে, জীবনও কমে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ধৈর্য্যও কমে আসতে বাধ্য। আজ যদি কেউ রুশোর মতন ছোট্ট করে গুছিয়ে লিখতে পারেন তা সে গান্ধীজী, কিন্তু তিনি তাঁর ভাষা না দিয়ে দিলেন কি না চরখা!

তাঁহারা—কেন, সেটাও ত আপনার মতে Windmill, ছোট্ট সংস্করণের।

আমি—জগৎ চায় কথা, কল নয়।

তাঁহারা—কথা চায় আপনাদের মতন বাক্যবাগীশের দল, আমরা চাই কাজ। কথায় যদি চিঁড়ে ভেজে তবে আপনিই কেন মানুষের নতুন মনোভাব বুঝে নতুন বুলি রচনা ও প্রচার করুন না। আপনি বোলবেন, মানুষের মনোভাব বদলে গিয়েছে, আমরা বুঝছি, অন্ততঃ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য শুনে যে, আদিম অসভ্য জাতির মনোভাব থেকে আপনার মনোভাব বড় বেশী পৃথক নয়।

আমি—আদিম যুগে স্ত্রীজাতির অবস্থা যে রকম ছিল ভাবেন তা মোটেই নয়। তবে পৃথিবীতে কেবল উন্নতি হচ্ছে এবং এখন গোটা কয়েক সমাজে যা হচ্ছে তাই ভাল হচ্ছে, এ রকম বিশ্বাস যদি থাকে তা হলে আগে সমাজ অত্যন্ত অবনত ছিল মানতেই হবে। কিন্তু সমাজ-তত্ত্বে ও জাতিতত্ত্বে a priori concept আর চলে না, অন্ততঃ টাইলর, মরগ্যান মারা যাবার পর থেকে। Lowie সাহেব Primitive Society বলে একখানা পুস্তক লিখেছেন—খাসা বই, একবার পাতা উল্টে দেখবেন, সেই বই-এর অষ্টম অধ্যায়টি কিন্তু মন দিয়ে পড়তে হবে, বিশেষ করে ২০০ থেকে ২০৩ পাতা। এই যে বইখানি হাতের কাছেই রয়েছে; শুনুন—'However from facts cited it is already clear what attitude the ethnologist must assume towards the popular opinion that ***woman's status is a sure index of cultural advancement***. That proposition is ***utterly at variance*** with the ethnographic data. In the very simplest hunting communities, among the Andaman Islanders and the Vedda, woman is to all intents and purposes ***man's peer***. This does not hold for most of the higher primitive levels, say, for the average Bantu village, where woman, though hardly a mere slave, does not at all events rank as man's equal. Finally, on the still higher plane of Central Asia and China, woman is definitely conceived as an inferior being. Or, to look at the matter from another angle, George Eliot and Mme Récamier, in spite of their social influence, did not even remotely approach the legal position of the average Iroquois matron." সাহেব পরে লিখছেন—That she is generally well treated..., that it is precisely among some of the rudest peoples that she enjoys practical equality with her mate—আদিম মানব অবশ্য মেয়েদের সঙ্গে ছিব্লামী করত না, তার ব্যবহারে কোন প্রকার sentimental gallantry ছিল না, সেই জন্য বোধ হয় আপনাদের আদিম মানব সম্বন্ধে ঐ প্রকার ধারণা।

তাঁহারা—আপনার বক্তৃতা অনুসারে বলতে হবে যে, স্ত্রী-জাতির অবনতি হয়েছে।

আমি—উন্নতি, অবনতি জানি না, তবে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ জগতের অন্যান্য সম্বন্ধের মত বদলে গিয়েছে। আমিও কিছুদিন পূর্ব্বে এই নতুন সম্বন্ধের একটি ঘরোয়া আটপৌরে, 'ওগো হ্যাঁগো'র মতন নাম খুঁজছিলাম। সমস্ত অভিধান তন্নতন্ন কোরে খুঁজেছি, পেয়েছি Inter-dependence. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গোছের। আ রামঃ, এ বুলির না আছে রস, না আছে কষ। আজকাল কেউ আর স্বাধীন নেই, আগে কি ছিল জানি না।

এখন মানুষ নির্ভর কোরছে নায়গারার উপর, নয় হাওয়ার ওপর, ইংলণ্ড নির্ভর করছে আমেরিকার ওপর, ভাটপাড়া নির্ভর করছে জার্ম্মানির উপর, বেদান্ত নির্ভর কোরছে বেদান্তের ওপর, নেতা রয়েছেন ভোটারের ওপর, ভোটার রয়েছেন খবরের কাগজের ওপর, সহর কোরছে গ্রামের ওপর, এবং পুরুষ নির্ভর কোরছেন স্ত্রীর ওপর, এবং স্ত্রী নির্ভর কোরছেন দাসীর ওপর। সব ইচ্ছা করে, জেনে-শুনে। সেই জন্য ভর দেবার অধিকার জন্মেছে এবং ভর সইবার কর্ত্তব্য হয়েছে।

তাঁহারা—আগে কি ছিল?

আমি—আগে অধিকার ও কর্ত্তব্য নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা হত না। সেই জন্য সংসার যা-হোক করে চলত। ভাল ভাবে চলছে, কি মন্দ ভাবে চলছে, কেউ ভাবত না। এখন ধরুন আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেয়াল সচেতন হয়ে উঠল, তখন আমাতে দেয়ালেতে বেধে গেল যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে মাথাই ফাটুক আর দেয়ালই টুটুক্, মাথার সঙ্গে দেয়ালের equal partnership হতে পারে না। অবশ্য অনেকের মাথা যখন দেয়ালের মতনই শক্ত হয় তখন সাম্য সম্ভব। স্বামী-স্ত্রী দু-ই বোকা হলে বিবাহিত জীবন সুখকর হয় দেখেছি, কেন না তখন equality in faithful nonentity. যাবতীয় সম্পত্তি ঠিক সমভাবে সমস্ত লোকেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলে কারুর ভাগে যে দুটার আনার চেয়ে বেশী পড়বে না এ তথ্যটি টের পেলে equality in poverty পছন্দ কোরবেন না, আমি শপথ কোরে বলতে পারি।

তাঁহারা—অত inspired হলে আমাদের যে থৈই হারিয়ে যাবে। একটু ধীরে, বন্ধু ধীরে। তা হলে দেয়ালে আর স্ত্রীলোকে এক হল, এবং বোকারাই সুখী প্রমাণ হল?

আমি—আজ্ঞা হাঁ, ওথেলো পড়ে রুমাল সামলে রাখাই বিধেয় এবং মহাভারত পড়ে পাঁচ স্বামীর বেশী সংখ্যক স্বামী অশাস্ত্রীয় (অবশ্য দেব-দেবতা ছাড়া) বিবেচনা করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ প্রমাণিত হল। আমি বলছি পুরুষ এত দিন ছিল আত্মনির্ভরশীল, বাইরের কাজে এবং ঘরের কাজে স্ত্রী ছিলেন আত্মনির্ভরশীলা। এখন আত্মাশক্তি সচেতন হয়ে এলোচুলে, ঘুমচোখে, মিঠে আধ আধ ভাষায় বোলছেন,—"আর পারি না, আমি এই সরে দাঁড়ালুম, দেখি কি কোরে দাঁড়িয়ে থাক"। এখন পুরুষ বোলছেন, নয় লুকিয়ে বুদ্ধিমানের মতন, নয় চেঁচিয়ে বোকার মতন, অসভ্যের মতন অর্থাৎ আমার মতন, 'কি আর পেয়েছ সখি। বেশ, না হয় পুরাতন অভ্যাসেই ফিরে যাবো, এ কয়দিন তোমাদের উপর নির্ভর করে বড়ই অলস হয়ে পড়েছি। তোমরা কি ভাব তোমরা ছাড়া সংসার চলবে না? তোমরা যে ভাবে চাইতে, সে রকম চলবে না বটে, কিন্তু আমাদের মতে বেশ চলবে। আমাদের ব্যাকরণে জগৎ 'গম' ধাতু হতে উৎপন্ন, গচ্ছতি ইতি জগৎ, কোন উপসর্গ নেই। আমরা যে রকম ভাবেই সংসার চালাই না কেন, তোমরা খারাপ বলতে পাবে না, কেন না তোমরা পূর্ব্বেই সড়ে দাঁড়িয়েছ! আমাদের টেবিল না হয় অ-গোছাল থাকবে, আমরা না-হয় তোমাদের মতে উচ্ছৃঙ্খল হব, কিন্তু পুরুষের সে-ই শৃঙ্খলা'।

তাঁহারা—কিন্তু ছোট কাজ চলবে কি করে?

আমি—আমার বিশ্বাস ছোট কাজ আমরা একটু মন দিলে বেশ সুচারুরূপেই চালাতে পারি। সব বড় chef-ই পুরুষ, সীতা সাবিত্রী হাঁড়ি ধরতে জানেতন না। তা হলে ব্যাস বাল্মিকী ছেড়ে কথা কইতেন? বিরাট রাজার সভায় পুরুষ ভীমসেনই সুপকার ছিলেন এবং নল রাজা তাঁহার রাজ্যে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পাচক ছিলেন শাস্ত্রে আছে। মেয়েরা রান্নাঘরে ঢুকেও কাঁদেন, না প্রবেশ কোরতে দিলেও কাঁদেন।

তাঁহারা—দেখুন, আপনি একেবারে যুদ্ধং দেহি হাঁক দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে আপনিই সব চেয়ে আগে পরাস্ত হবেন।

আমি—আমার কথা আর কইবেন না! রামপ্রসাদ সেন বড় সাধক ছিলেন, তাই তিনি ছড়া কেটেছেন, আয় মা, সাধন সমরে, মা হারে কি পুত্র হারে!—মা বিনে কি ছেলে বাঁচে না ভাবেন? মা মরা ছেলে খুব শক্ত হয়, স্ত্রী-মরা স্বামী খুব সংসারী হয়, এবং স্ত্রী মারা গেলে স্ত্রীলোকেরাই স্বামীকে ভাগ্যবান বলেন। মা'র সঙ্গে কিম্বা স্ত্রীর সঙ্গে যদি বেশ

বুদ্ধি খাটিয়ে ঝগড়া করেন তা হলে আপনাদেরই জয় হবে।

তাঁহারা—মা'র কথা অন্য, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কখনও জয় লাভ হয় না।

আমি—হয়, যদি বুদ্ধি থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে খাটান। পুরুষের বিপদ অবশ্য মা নিয়ে নয়,—স্ত্রী, না হয় বন্ধুপত্নী, না হয় বন্ধুর ভগ্নী নিয়ে।

তাঁহারা—প্রত্যেক স্ত্রী ত একাধারে সবই।

আমি—ভুল, মস্ত ভুল, পাখীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন রামপাখী, ভুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামভুল, অন্ততঃ উত্তর রামচন্দ্র ঐ ভুল করেছিলেন। প্রত্যেক নারী কারুর না কারুর স্ত্রী, আপনার স্ত্রী আপনারই এবং বন্ধুর পত্নী সাধারণতঃ বন্ধুদেরই হয়। নারীর বিবাহের পূর্ব্বে মনের অবস্থা কেউ জানতে পারে না, তবে অল্প বয়সে ছোড়্দাকে, জামাই বাবুকে কিম্বা সেজ্দার সহপাঠীকে যে নারী কি চোখে দেখতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি উপায়ে। একবার বোলে দেখবেন স্ত্রীকে, "তোমার ছোড়্দা তা বলে কার্ত্তিক ছিলেন না, কিম্বা, তোমার জামাইবাবুর মাথায় বরাবরই টাক ছিল, কিম্বা, তোমার সেজ্দা চিরকালই ঐ রকম লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে মিশে আসছেন," উত্তর কি পান আমাকে বলবার দরকার নেই। অবশ্য Freud-এর ব্যাখ্যা আমি মানি না।

তাঁহারা—সমস্ত স্ত্রীজাতি ধন্যা হলেন। আপনার ব্যাখ্যাটি কি শুনি।

আমি—যে কোন ব্যক্তিকে আদর্শ-নায়ক বিবেচনা কোরতে বালিকারা বালকের অপেক্ষা পারদর্শী। বালিকারা বড়দিদির বন্ধুকে এবং বালকেরা ইন্দ্রনাথকে পূজা করে, কিন্তু আত্মবিসর্জ্জনের হিসাবে বালিকারাই বালকদের হারিয়ে দেয়। আপনাকে ভুলতে মেয়েদের মতন আর দুটি জাতি নেই। এ পূজায় অবশ্য কামের গন্ধ নেই, এইখানেই নব্য মনস্তত্ত্বের গলদ।

তাঁহারা—আদর্শ ভেবে পূজা করা, অর্থাৎ idealise কি lionise করা স্ত্রীর প্রধান কার্য্য ভাবেন না কি?

আমি—তা ভাবি না। ভাবি আরো খাঁটি কথা, অর্থাৎ সুখের বিবাহিত জীবন মানে ঐ প্রকার sentimental idealism. স্ত্রী ভাবছেন আমার স্বামীর তুলনা নেই, আর স্বামী ভাবছেন—আমার স্ত্রীর মতন স্ত্রী নেই। এখন আমার বলবার কথা এই যে, ঐ প্রকার মনোভাবের জন্য মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী vocational training পায়। আমি কামের কথা মনেও আনি নি।

তাঁহারা—খুব সামলে নিয়েছেন কিন্তু। আমাদের মনে হয় যে, স্ত্রীজাতি বরাবরই গোষ্ঠীভক্ত, সেই জন্য তাঁরা বাপের বাড়ীর কোন লোকের নিন্দা সহ্য কোরতে পারেন না। এতে নারীর স্ত্রীত্ব কোথায় গেলেন? তবে যদি স্ত্রীত্ব মানে স্নেহ করা হয়, তা হলে স্ত্রীত্বও যা মাতৃত্বও তাই। আপনার তর্কে কোন বাঁধুনী নেই, মানেও নেই, এবং সে তর্কে কোন ভদ্রতাও নেই।

আমি—অভদ্রতা কোথায় পেলেন? Freud-কে বাদ দিয়েছি, Flugel-এর নাম পর্য্যন্ত করি নি! তর্ক আমি করছি না, করছি বক্তৃতা, যা আপনারা শুনতে চেয়েছেন। বক্তৃতার মুখে বাধা দেবেন না, আধ-কপালে ধরবে, ধরুন বাজে কথাই বলছি। স্ত্রীত্ব মানে capacity for idealisation-ই ধরছি আপাততঃ। এ ত গেল অল্প বয়সের স্ত্রীত্ব—নারীত্বই বলি, না হলে চটে যাবেন। তারপর নারীর বিবাহ হল। বিবাহের দুই তিন মাস পর থেকে দেবর ঠাকুররা যে প্রকারের চিঠি পান তা দেখবার আমাদের মতন বাড়ীর বড়ছেলেদের সুবিধা নেই, যদি সুযোগ থাকত আমাদের, তা হলে বুঝতাম যে, সভ্যজগতে junior levirate-এর ল্যাজ এখনও খসে নি। তারপর স্ত্রী মাতা হলেন, সব ভালবাসা পড়ল সন্তানের ওপর, "এমন ছেলে দেখনি গো দেখনি, এত দুষ্টু যে এই মোটে তিন বছরের ছেলে খিদে পেলে হাঁ করে, আর পিসীমাকে পি পি বলে।" সন্তানের পনের বছর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রী মা হন সন্তানের কাছে, এবং স্ত্রী হয়েই থাকেন স্বামী ও স্বামী-বন্ধুর কাছে। ছেলে যেই কলেজে গেল, একটু উড়তে আরম্ভ করলে, ছেলের মা, অর্থাৎ ছেলের বাবার স্ত্রী ছেলেকে নিজের শিকলীতে বাঁধতে কত না আদর যত্ন আরম্ভ করলেন। এই চলল চিরকাল, ছেলের বিবাহ পর্য্যন্ত—তার পর হিংসা, না হয়

আদর্শ ত্যাগ, "বৌমা, এখন তোমার জিনিষ, তুমি দেখো মা, আমি কাশী চলনুম"। মেয়ের যেই বিবাহ হল, অমনি মেয়ের প্রতি জামাইয়ের মন বসাতে, মা শনিবার বেলা তিনটা থেকে মেয়ের চুল বেঁধে নিজে চুল বাঁধতে ও প্রসাধন কোরতে আরম্ভ করলেন, জরী পেড়ে ধোপ দোরস্ত কাপড় পরলেন। আজ কালকার ছোট্ট শাশুড়ীরা রঙ্গীন কাপড় পরতে চান্ না, 'ওমা, জামাই আসছে যে!' তারপর অবশ্য ছোট্ট জা, দেবর ঠাকুর, এমন কি মেয়েরও একান্ত ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ফিকে রং-এর কাপড়টি বার করলেন, কিন্তু স্বামীর ঠাট্টার জালায় আর পরা হল না তারপর নাতি, নাৎনী হল, তখন স্ত্রী কি করেন? তারা যে সব্ পরের ছেলেমেয়ে! কবে বড় হবে! হাতে কাজ নেই, মন ফাঁকা ফাঁকা, তাই কপালে জল্ জলে সিঁদুর পরে, হাতের নোয়ায় সিঁদুর দিয়ে, টক্ টকে লাল হাতী অর্থাৎ গিন্নী পেড়ে কাপড় পরে স্বামীর পদে মন দিলেন। স্বামীর সেবা সুরু হল। "বেশীক্ষণ বাইরে থেকো না, গলায় কম্ফর্টার জড়াও এবং মাথায় টুপী পর, না হলে কাসি হবে, এক সঙ্গে ছাতি ও লাটিটা নাও, বিষ্টি, রদ্দুর ও রাস্তায় কুকুর আছে, গরম দুধ খেয়ে যাও, চ্যাবনপ্রাসটি আনতে ভুলো না"—এই ধরণের সেবা। স্বামী বেচারী হতভম্ব! চিরকাল অনাদরে পুষ্ট, এই অকালবৃষ্টি প্রেমের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে উঠলেন। দড়ি ছেঁড়বার যদি শক্তি থাকে, ছুটে একেবারে পিঁজরাপোলে, না হয় গোলদীঘি কি হেদোতে হাজির, যদি না থাকে বছর দুই-এর মধ্যে মৃত্যু। যদি না মারা গেলেন, এবং পিঁজরাপোলে যেতে আপত্তি করলেন, অর্থাৎ যদি শিঙ্ নেড়ে বোল্লেন, ও সব চালাকী আমার এ বয়সে চল্‌বে না, তখন স্ত্রী সংসারে বিরক্ত হয়ে মন্ত্র নিলেন। তখন গুরুই ধ্যান, গুরুই জ্ঞান। জপ, তপ, ব্রত, সাধনা, দান খয়রাৎ জোরসে চলতে লাগল। এর পর কোন স্বামী বাঁচতে পারে না। একবার যা হোক করে বিধবা হতে পারলে, বাস্—বৃদ্ধা অনুতাপক্লিষ্টা হয়ে মোটা হতে লাগলেন, এবং নাতি ও নাৎ-বৌ ও নাৎ-জামাই নিয়ে ঠাট্টা আরম্ভ করলেন। নাৎ-বৌ আর কতদিন সহ্য করবে! সকলে মিলে পরামর্শ কোরে অত্যন্ত আইন সঙ্গত ভাবে বুড়ীকে খুন করা হল—অর্থাৎ গঙ্গা যাত্রা, অর্থাৎ ghat murder আর না হয় বোনের বাড়ী, না হয় কাশী পাঠান হল। সেখানেও বুড়ী নতুন সম্বন্ধ পাতাতে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু পরমায়ু ফুরিয়েছে, তাই বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণামৃত পান কোরে মনি কর্ণিকার ঘাটে আশ্রয় নিলেন। এ জন্মের স্ত্রীত্ব ঘুচল, আসছে জন্মের স্ত্রীত্ব শুরু হল।

তাঁহারা—আপনার বর্ণনা সত্য বোলে গ্রহণ করতে রাজী আছি, প্রথমতঃ যদি আমরা আপনার বর্ণনাকে কেবল মধ্যবিত্ত হিন্দু সংসারের অভিজ্ঞতার বিবরণ ধরি, এবং দ্বিতীয়তঃ যদি স্ত্রীত্ব মানে প্রেম এবং আপনভোলা স্বার্থত্যাগ এবং স্নেহ বুঝি। আজকালের শিক্ষিতা মহিলারা কিন্তু অন্যরূপ আচরণ করেন।

আমি—শিক্ষার বশে যে স্ত্রী-প্রকৃতি বদলে যায় জানি না, শুধু একটু মার্জ্জিত হয় এই মাত্র। সংখ্যায় আমাদের দেশে অ-শিক্ষিতা এবং কু-শিক্ষিতা মহিলাই বেশী। আমি কোন রূপ দোষগুণ নির্দ্ধারণের কথা বলছি না—হয়ত সবই সমাজের দোষ। এক Mrs. Ward কি Meredith-এর নভেল ছাড়া আর প্রায় সব নভেলেই ইংরেজ রমণীরাও ঐ আচরণ করেন। গলসওয়ার্দি ও D. H. Lawrence সবই Butler-এর Way of all flesh-এর পথেই চলেছেন। গরীব সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমন কি পুরাতন জমীদার সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বর্ণনা সত্য, একটু আধটুক বদলে নিতে হবে। আপনাদের দ্বিতীয় সর্ত্ত সম্বন্ধে আমার আপত্তি ছিল, কিন্তু তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি।

তাঁহারা—মেনে নিতেই হবে—না হলে মিথ্যাবাদী হতে হবে। বাস্তবিক ভালবাসাই স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম—অন্ততঃ প্রধান ধর্ম্ম। সেই জন্যই তাঁদের শ্রদ্ধা করি।

আমি—মানছি, কেন না আমার ওরকম সুনামের কোন দুরাশা নেই! ধর্ম্ম এক, অতএব প্রধান অ-প্রধান নেই। ভাল বাসাই স্ত্রী-ধর্ম্ম, নারী ধর্ম্ম বোলেই আমি সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেককে ভালবাসি। এবং তাঁরা ভালবাসাই চান্, শ্রদ্ধার চেয়ে, অবশ্য দুই-ই পেলে তাঁহারা সহজেই কৃতার্থ হন। এখন আমার বক্তব্য এই যে, যখন ভালবাসাই তাঁহাদের জীবনীশক্তি তা হলে স্বাধীনতা,

সাম্য মৈত্রী কোথায় গেল? প্রেম ও মৈত্রীভাব আলাদা, একটাতে mystery আছে, অন্যটি খোলাখুলি একটা মাথুর জ্যোৎস্না, আর একটি লক্ষ্ণৌ-এর বৈশাখী রোদ। অতএব মৈত্রীকে বাদ দিতে হবে। লোকে যখন বলে ভালবাসা সমানে সমানে হয়, তখন আমার ইচ্ছা করে Vaihniger-এর Psychology of 'As If' বইখানি তাঁদের চেঁচিয়ে পড়ে শোনাই। সাম্য ও স্বাধীনতা হচ্ছে কাজ চালাবার জন্য ছুতো, কলে তেল মাত্র! ও সব উপমা, ও সবের অস্তিত্ব নেই, সবই 'যেন'—অর্থাৎ fiction মাত্র! মানুষ এক সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক ও আদর্শবাদী। যখন বস্তু পিছিয়ে পড়ে এবং আদর্শ এগিয়ে যায়, তখন বড় বড় Utopia তৈরী হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে আদর্শ বেশী বড় নয়, বেশী দূরে নয়, তবুও দৈনন্দিন ঘটনার দশ বিশ হাত এগিয়ে থাকে, সেই জন্য মন ছোট্ট ছোট্ট 'যেন' সৃষ্টি করে! অ-সাধারণ লোকের পক্ষে, কিম্বা মানবজাতির পক্ষে আদর্শ বহুদূরে ও খুব বড়। মনের সৃষ্টি বোলে এই 'যেন'গুলি সত্য, কিন্তু আপনারা ইট কাঠকে যেমন সত্য ভাবেন; সে রকমের নয়, 'যেন' হচ্ছে উপমার মতন সত্য।

তাঁহারা—সাম্য, স্বাধীনতা তাহলে উপমা হল!

আমি—কি করব! তাই দাঁড়াচ্ছে যে! আচ্ছা যদি উপমা বোলে স্বীকার করতে না ইচ্ছা হয়, তা হলেও সাম্য ও স্বাধীনতা মানে স্বধর্ম্ম বিকাশের সুবিধা মাত্র। স্ত্রীজাতির স্বধর্ম্ম যেমন ভালবাসা তখন সাম্য ও স্বাধীনতা মানে স্ত্রীজাতিকে অবাধে প্রেমে পড়তে দিতে হবে।

তাঁহারা—কেন, বাঙালীর মেয়েরা কি ভালবাসায় পড়েন না?

আমি—তাঁরা বলেন তাঁরা ভালবাসেন, অর্থাৎ অভ্যাসের বশে যা তা কোরে, জোড়াতাড়া দিয়ে, নিজেদের ঠকিয়ে স্বামীর সঙ্গে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই আমার অনেক ভুল বিশ্বাসের মধ্যে একটি। বর্ত্তমান সমাজে বিবাহিত জীবন মোটেই সুখকর নয় এবং প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী মিথ্যার আবেষ্টনে কালাতিপাত করেন। দুজনে প্রেমে পড়লে একজনকে নীচু হতেই হয়। এ দেশে ভালবাসবার ক্ষমতা নেই, সকলেই সাবধানী পথিক। বিদেশে কি হয় জানি না, বই পড়েছি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। শুনেছি, প্রেম এক প্রকারের পাগলামী এবং বিকার—সত্য মিথ্যা জানি না। বিকারের অবস্থায় নিক্তির ওজনে rights মাপা হতে পারে বিশ্বাস হয় না, আর সুস্থ অবস্থায় যে অনবরত নিক্তি নিয়ে বেড়ায় সে নয় এক প্রকারের বিকাররোগী, নয় বৈজ্ঞানিক। এক ধরণের স্ত্রী আছেন তাঁরা স্বামীকে কেবল প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমাকে কতখানি ভালবাস? আমি যতখানি ভালবাসি তুমি ততখানি ভালবাস কি? নিশ্চয়ই না।' এই মনোভাবটি পেকে উঠলে স্বামীর ওপর সন্দেহ আরম্ভ হয়। শিক্ষিতা মহিলারাও স্ত্রীলোক —তাঁদের রুচি মার্জ্জিত বোলে তাঁরা jealous হওয়া মহাকালী-বিদ্যালয়-ফেরত বালিকা-বধূ-সুলভ অসভ্যতাই বিবেচনা করেন। সেই জন্য তাঁরা স্বামীর চরিত্রে সন্দিহান না হয়ে (কিম্বা হয়েও) স্ত্রী-সাম্যের বক্তৃতা দেন। একে rationalisation বলে।

তাঁহারা—আমরা হিন্দু, আমরা প্রেম বুঝি না, বুঝি বিবাহ।

আমি—বিবাহ সকলেই বোঝে। বিবাহ প্রবৃত্তি কাম প্রবৃত্তির মতনই আদিম প্রবৃত্তি—আমি Freud কে সংশোধন করে একটা কেতাব লিখব ভাবছি। বিবাহের কথা যদি তোলেন তা হলে সাফ্ সাফ্ কথা শোনবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। বার্ণার্ড্ শ-এর সংজ্ঞাটিও আজ কাল খাটে না, temptation minimum হয়ে গিয়েছে। বিবাহ একটি warfare অস্বীকার করা উট্ পক্ষীর পদ্ধতি, খরগোস-প্রবৃত্তি। তবে এ যুদ্ধের বার্ত্তা অত্যন্ত censored হয়ে আসে। কিন্তু প্রত্যেক জীবই জানে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। একটি নর এবং একটি নারীর মধ্যে ধর্ম্ম ও আইনসঙ্গত গোপন যুদ্ধের নাম বিবাহিত জীবন। এ যুদ্ধ যত গোপন ততই আদর্শানুযায়ী। মহাভারতে পড়েছি যুদ্ধের প্রারম্ভে হুলুধ্বনি ও শঙ্খ নিনাদ হত, এখনও ভারতে দুটি প্রাণীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় শঙ্খ ও হুলুধ্বনি দিয়ে, এবং সেই যুদ্ধের অবসান হয় একমাত্র হরিধ্বনিতে। বিদেশী ও বাঙলা সাহিত্যের কাল হচ্ছে হুলুধ্বনির পর থেকে হরিধ্বনি পর্য্যন্ত।

তাঁহারা—বিবাহিত জীবন একটি যুদ্ধের অধ্যায় বোলতে পারেন, সারা জীবনই ত যুদ্ধ ক্ষেত্র।

আমি—হতে পারে, কিন্তু বিবাহিত জীবনই Western Front, তার পরই Treaty of Versailles 1918 A. D.) অর্থাৎ সমাধি।

তাঁহারা—বোঝা গেল না সমাধি কেন ?

আমি—সমাধি মানে আত্মসমর্পণ—চৈতন্ত প্রভুর মতন নীল সাগরে ঝাঁপ। বামাকান্ত বাবুর জীবনে একটি ঘটনা ঘটে আমি জানি। বিবাহের পূর্ব্বে বামাকান্ত বাবুর প্রিয় খাদ্য ছিল লুচির সঙ্গে গরম গরম আলু ভাজা এবং এবং মাংসের ঝোল। আলু ভাজা বেশ লাল খর ভাজা হবে এবং মাংসের ঝোল খুব ঘন ও মশলা দেওয়া হবে। বামাকান্ত বাবু বিবাহ করেছিলেন বৈষ্ণবের বাড়ী, এবং তাঁর স্ত্রীরও ছিল দাঁতের অসুখ। সেই জন্য শ্বশুর বাড়ীতে কড়া আলু ভাজা ও মাংসের হাড় চিবুতে নব বধূর দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুল। বৌমার জন্য নরম আলুভাজা ও কাঁটাবিহীন পাকাল মাছ বরাদ্দ হল। বৌমা শাশুড়ীকে বোল্লেন, 'আমার জন্য কষ্ট করছেন কেন মা, আমি আলু ভাজা ও মাছ ভালবাসি না, খাই না'। বৌমা আর আলুভাজা ও মাছ খান্ না, শুধু সধবার লক্ষণ হিসাবে স্বামীর পাতে মাছের ঝোলের সঙ্গে এক গ্রাস ভাত মেখে মুখে তোলেন। কিছুদিন পরে বামাকান্ত বাবু বিদেশে চাকরী কোরতে গেলেন বৌমাকে নিয়ে। দীর্ঘ তিন বৎসর পরে যে দিন বামাকান্ত বাবু দেশে ফিরলেন সে দিন আমার নিমন্ত্রণ হল। দুপুর বেলা খেতে বসেছি, বামাকান্ত বাবুর মা দু'বাটি মাংসের ঝোল এবং এক থালা কড়া আলুভাজা নিয়ে এলেন। বামাকান্ত বাবু তাই দেখে বোল্লেন, মা, এ করেছ কি? এ রকম পোড়া আলুভাজা মানুষে খায়? না, এ রকম ঘন মশলা দেওয়া কালিয়া হিন্দুতে খায়? তুমি মেলেচ্ছ হ'লে না কি? জননী বোল্লেন, সে কি রে বামা, তুই যে কড়া আলুভাজা ছাড়া নরম খেতিস নে! ঝোল ঝোল মাংস রাঁধলে বলতিস, 'এ কি অরন্ধনের নেমন্তন্ন খাচ্ছি যে সব পান্তা খাব ?' আমি সেই জন্য নিজে ভাজলুম ও এই অবস্থায় রাঁধলুম। বামাকান্ত বাবু হাসিমুখে যা উত্তর দিলেন তা শুনে আমার আর খাওয়া হল না! পিত্তি জলে উঠল। মা, ছেলেবেলা ত তোমার বুকের দুধ পিয়ে মানুষ হয়েছি, তাই এক বাটি এনে দাও না, ও রকম পোড়া আলুভাজা ও কোর্ম্মা কাবাব খেলে আমাকে দেশ ছাড়তে হবে তাড়াতাড়ি। জননীর চোখে জল দেখে আমি উঠে পড়লুম। সন্ধ্যা বেলায় বামাকান্ত বাবুর সঙ্গে গোলদীঘির ধারে দেখা হল। আমি বল্লুম, ছিঃ তোমার না হয় বিবাহ করে স্নেহ মমতা অন্ত মুখে গিয়েছে, কিন্তু ভদ্রতাও ভুলে গিয়েছ কি? এতদিন পরে এলে আর আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে এই ব্যবহার! বামাকান্ত বাবু যা উত্তর দিলেন তাই হুবহু বলছি আপনাদের—ভাই, আর আমি কড়া আলুভাজা ও বিশেষ করে মাংস কিছুই খাই না। যদি মাংস ঘন করে রাঁধা হয় ত হলে মনে হয় গোস্ত খাচ্ছি। আমার স্বাদ কি করে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তার একটি ইতিহাস আছে। আমার স্ত্রী ডাকসাইটে সতী, তাঁর পাতিব্রত্য সীতা, দময়ন্তী ঐ ক্লাশের। বিদেশে গিয়ে দেখলাম, স্ত্রীর দাঁত বড় পল্‌কা, মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা এমন কি কড়া আলুভাজা খেলে তাঁর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। কচু ও কাঁচকলা ও মোচার উপর ভক্তি তাঁর, পিতা বৈষ্ণব বলে নয়—বিদেশে মাছ মাংস পাওয়া যায় না, দাম বেশী, পয়সা কম, মোচা দুর্ল্ভ, পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে কচু ও কাঁচকলা। স্ত্রী বেশী দাম দিয়ে, দূর দেশ থেকে জেলেকে ও কষাইকে খোসামোদ করে মাছ মাংস আনাতে লাগলেন, অথচ নিজে খাবেন না। স্ত্রীর মুখে শুনলাম যে, সেখানে হিন্দু রমণীরা মাংস খান না, কোন প্রকার শীকার বাড়ীতে আনা মহাপাপ। কাক ও বাঁদরকে গুল্‌তী ছুঁড়ে মারাও অশাস্ত্রীয়। কড়া আলু ভাজা আমার জন্য হত, নতুন করে তাঁর নিজের জন্য নরম ভাজতে তাঁর গতর উঠত না। বেচারী শুধু শাক, ডাল খেয়ে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। আমি দেখলুম, তুচ্ছ মাছ মাংস ও আলুভাজার জন্য একটা প্রাণী হত্যা করতে বসেছি। দপ্তরের মুসলমান চাপরাসীর বাড়ী থেকে রান্না মুরগী খাওয়া ছেড়ে দিলাম—আমি

খাচ্ছি মুরগী, আর তিনি খাচ্ছেন পুঁইশাক! সেই সময় অহিংস অসহযোগের ধুম পড়ল। স্ত্রী রান্না করেন, আর বাকী সময় চরকা কাটেন। নিজে বরাবরই অহিংস, তাই দুজনে সহযোগে মাছ মাংস ছেড়ে দিলাম। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে আমার শরীর দুর্ব্বল হল, চরকা কেটে মাথা ঘুরতে লাগল। স্ত্রী বোল্লেন, আমার জন্যই তোমার শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, আমার মাথা খাও, মাংস ছেড়ো না। আমি তখন গান্ধীজীর ভয়ঙ্কর ভক্ত। ভক্ত হবার কারণও ছিল, কেন না আমি বুঝেছিলাম যে, গত দুই বৎসর ধরে আমার গৃহলক্ষ্মী যা বোলে এসেছেন মহাত্মাজী আজ তাই ইংরেজীতে বোলছেন অর্থাৎ অহিংস হও। অসহযোগটি আগে হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারি নি। তাই যখন স্ত্রী বোল্লেন, 'তোমার শরীর ভাল না হলে, মাংস না খেলে আমি অ-সহযোগ কোরব, তখন সমস্যায় পড়লুম। সে সমস্যা গান্ধীজীর সমস্যা অপেক্ষা কম কঠিন নয়—ধর্ম্ম রাখি, না পলিটিক্স করি। কতদিন যে এই দ্বন্দ্বে কাটালুম ভগবানই জানেন। কিন্তু নারায়ণই পথ দেখালেন। স্ত্রী একদিন ভোরবেলা আমার ঘরে এসে বোল্লেন, ওগো ওঠ, মা কালী আমাকে কি স্বপ্ন দিয়েছেন শোন, মা কালী একটি লাল পেড়ে কাপড় পরে যেন আমাকে ডাকছেন, মুখখানি দেখতে ঠিক ছোট মাসীমার ননদের মতন, বোলছেন, 'মিনু, তুই এবার থেকে আমার পূজা কর্'! এই বোলে আমার হাতে একটি ছাগলছানা দিয়ে অদৃশ্য হলেন। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে—এবার থেকে তোমার মাংস খেতেই হবে। সেই দিন থেকে ফের্ মাংস খাওয়া আরম্ভ করলুম। বিকালে চায়ের সঙ্গে মাংসের চপ, রাতে কালিয়া। মনে একটু দ্বিধা হল, কিন্তু স্ত্রী বোল্লেন, 'মা কালীর অপমান কোরো না।' একটা রফা হয়ে গেল, আমি ছাড়লুম অহিংসা, তিনি ছাড়লেন অসহযোগ। সাত দিনেই মাংস খেয়ে শরীর ফুলে উঠল। একদিন সাহেবের শ্যালক মারা গিয়েছে বোলে আফিসে বেলা বারটার সময় ছুটি হল, বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি স্ত্রী বারান্দায় বসে এঁচোড়, মানকচু ও কাঁচকলা কুটছেন, আমাকে দেখে শিউরে উঠে আঁচল দিয়ে তরকারীগুলি আবৃত করলেন। হঠাৎ দিব্য দৃষ্টিতে সব বুঝতে পারলুম—তা হলে এতদিন মাংস খাইনি, কচুর চপ, আর এঁচোড়ের ডাল্‌নাই খেয়ে এসেছি! যাই হোক, তৎক্ষণাৎ মনকে প্রবোধ দিলাম, 'ভাল লাগা, আর শরীর ভাল হওয়া নিয়ে কথা—সহযোগের দামই কচু ও কাঁচকলা! না হলে মাংস আর কচুতে প্রভেদ কোথায়? এ রকম স্বপ্ন সতীরাই দেখেন, এ রকম প্রবঞ্চনা সাধ্বী পতিময় রমণীর দ্বারাই সম্ভব!' তাই যেন না দেখে ঘরের ভেতর গিয়ে বিছানার আশ্রয় নিলাম। ঘুম এল না, বিকাল বেলায় তিনি চা ও চপ্ নিয়ে হাজির। আমি আরও চপ্ চেয়ে তাঁকে অপ্রস্তুতে ফেললাম। ভাই, এখন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। এখন আর কাবাব কোপ্তা ভাল লাগে না।

আমি বল্লুম—বেশ না হয় স্বাদ বদলে গিয়েছে, কিন্তু সভ্যতা স্নেহ, মমতা বদলে গিয়েছে কি?

হঠাৎ বামাকান্ত বাবু আমার কথা শুনে কি রকম হ'য়ে গেলেন, তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হল, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বোল্লেন, আমার অসভ্যতার জন্য দায়ী কোন ব্যক্তি নয়, দায়ী বিবাহিত জীবন, অর্থাৎ 'তোমার-জন্য-সব-পারি' এই মনোভাবটি। সেই দিন দুপুর বেলায় মনকে প্রবোধ না দিয়ে যদি অবোধ বালকের মতন কচু এঁচোড়ের তরকারী ছুঁড়ে ফেলে দিতাম, যদি স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করছি ভেবে আফিসের দপ্তরীর হাতে লুকিয়ে মাংস খাওয়া ছেড়ে না দিতাম, যদি তাঁর মনে কষ্ট দিয়েও তাকে কালিয়া কাবাব রাধাতাম, যদি তিনি আমার প্রেমের তাড়নায় ওরকম সতী-স্বপ্ন না দেখতেন, তা হলে তোমার মত ভদ্র সন্তান হতে পারতাম বটে। আমি আদর্শ বিবাহিত জীবন যাপন কোরতে উৎসুক হয়েছিলাম, তাই হাসি মুখে রোজ মাংস মনে করে কচু ও এঁচোড়ের চপ খেয়েছি। এই বিবাহিত জীবন অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত সরস—এতই সরস যে তার জন্য মহাত্মাজীর ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ত্যাগ করেছি। কি রকম সরস জান? এই যেমন বড় পাহাড়ে ময়াল সাপ আস্ত হরিণ গলাধঃকরণ করবার পূর্ব্বে মুখের লাল দিয়ে তাকে lubricate, রসাল করে। এই বোলেই বামাকান্ত বাবু হঠাৎ চলে গেলেন।

তাঁহারা—কি প্রমাণ হল ?

আমি—বামাকান্ত বাবুর মাথা খারাপ এবং মাথা খারাপ হয়েছিল মাংসের লোভে।

তাঁহারা—আপনার কাছে যত অস্বাভাবিক ঘটনাই শুনতে পাই।

আমি—স্বাভাবিক ঘটনা বড় কারুর মনে থাকে না। স্বভাব বুঝতে হলে স্বভাবের অতিরিক্তকেই বুঝতে হবে। সকলে যদি বুকে হাত দিয়ে কথা কন, তা হলে বুঝবেন যে, বামাকান্ত বাবু সকলের মধ্যেই আছেন, সেই হিসাবে ঘটনাটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিবাহিত জীবনে খাবার বেলায় compromise মানে নিক্তির ওজনে লেন্-দেন্ নয়, একেবারে আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ মাংসের বদলে কচু, অন্য ক্ষেত্রেও তাই। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা থাকে।

এখানে সাম্য কোথায় ? প্রকৃতিতে এবং মানব-সমাজে সাম্য সব চেয়ে বড় heresy-পাগ্লের কথা। মোটা চোখে বাইরে থেকে দেখলে সবই গড়-পড়তা সমান দেখায়, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে সবই অ-সম! এই অ-সাম্যই সব চেয়ে বড় লীলা—কার জানি না, তবে লীলাবৈচিত্র্যকে খাতির না কোরলে সুখী হওয়া যায় না। আমি অন্ততঃ নিজের জন্য বোলতে পারি যে, আমি সুখী হতে চাই। আপনারা যত পারেন গড়-পড়তা সাম্য বুঝে সমাজ-সংস্কার করুন, জগতের উপকার করুন—আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার সুখের অন্তরায় হবেন না।

তাঁহারা—এ অত্যন্ত স্বার্থপরের কথা! আজ আপনার বক্তৃতা শুনে বড়ই হতাশ হলুম, ভগ্নমনোরথ হলুম।

আমি—কেন ? আমার বিশ্বাস আমি দামী কথাই বলেছি, তবে তর্ক কোরে নয়। আপনারাও দেখছি আমার সঙ্গে মিশে ছাত্র হয়ে উঠছেন। যদি বক্তৃতার moral lesson চান তা হলে 'শৃণু রে বৎস'—বহু বচনে কি হবে জানি না—"সাম্য হচ্ছে একটি অবস্থা মাত্র, প্রেম অন্য একটি অবস্থা, ইযুক্লিড্ সাহেবের হুকুমে মানুষ একই সময় দুটি অবস্থায় থাকতে পারে না। ইংরেজ রাজার অধীনে থাকব, বিদেশী এম্পায়ারকে স্নেহ ভাবে আদর্শ গভর্ণমেণ্ট ভাব্ব অথচ আবদার কোরে equal partnership চাইব—এ রকম কথাবার্ত্তা contradiction in terms মাত্র। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন বিদেশী প্রভুত্বকে অত্যাচার বিবেচনা কোরেই সাম্য চাইছি, তেমনি স্বামীর প্রভুত্বকে অত্যাচার বিবেচনা কোরেই মেয়েরা সাম্য ও স্বাধীনতা চাইছেন। প্রেমে অত্যাচার-বোধ নেই, বিবাহে আছে—প্রেমের অত্যাচার অবশ্য চিরকালই থাকবে। ভালবাসাই স্ত্রী-ধর্ম্ম, সেই জন্য বলছি মেয়েদের অবাধে প্রেমে পড়তে দিলেই ধরতাই বুলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে!

* * *

তাঁহারা চলে গেলেন। Schopenhauer-কে না গ্রহণ ক'রে একটি ভিনিসিয়ন মেয়ে বাইরণকে ভালবেসেছিল, তারই ফলে Essay on Women. একটি ভিয়ানা সহরের ঝি Weininger-কে অপমান করেছিল, তাই তিনি প্রমাণ করলেন মেয়েদের আত্মা নেই এবং প্রমাণ করে Beethoven-এর ঘরে আত্মঘাতী হলেন। নীট্শেরও এ দুর্দ্দশা হয়েছিল, তাই তিনি পাগল হয়ে গেলেন। আমার জীবনে ওরকম কোন ঘটনা ঘটে নি, আমি কারুর সঙ্গে প্রেমেও পড়ি নি। তা হলে কি আমার স্ত্রী-বিদ্বেষ, বিবাহ-বিদ্বেষ একটি pose, চাল মাত্র? কিন্তু এরকম pose-এ আমাদের সমাজের কোন লাভ নেই।

আধঘুমন্ত অবস্থায় মনে হল যে, Byron ও Musset-এর প্রেতাত্মা আমার চারিধারে নৃত্য করছে। হঠাৎ আওয়াজ হল, সাহাব্, চিঠ্ঠি হ্যায়।

যা লিখেছি, সব ভুল, রাম ভুল! মেয়েরা বড় দেরীতে চিঠির জবাব দেয়—অন্য কোন্ দোষ তাদের নেই। এত বাজে কথাই কইতে পারি! যাই হোক কাল Social philosophy-র ক্লাশে ছেলেদের একটা বুক্নী দিতে হবে—Equality is a state, not a status.

মাতাল

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মদ খাই ?—খাই, মিছে কথা নয়,
মদ খেতে লাগে ভালো ;
মন্দ কি, যদি মরমের ব্যথা
ভোলা যায় সে ত' ভালো !
তৃষিত যে জনা সিন্ধুর তীরে
মাগিয়া বিন্দু বৃথা কেঁদে' ফিরে,
ফাগুনে উপোসী পতঙ্গ—সে যে
আগুনেরে বাসে ভালো।
মদ খাই,—দুখ নেই,
হাফিজের সাকী যে মদ বিতরে
কোথা পাব মদ সেই ?

আঙারের মত রাঙা আঁখি ?—তাই ?
বক্ষে যাহার হায়
শ্মশানের চিতা, আঁখি হবে রাঙা,
সন্দেহ আছে তায় ?
উন্মাদ আমি ?—তুমি উন্মাদ !
আঁখি দেখো, দেখ না কো আঁখি-পাত ;
মদ দেখো শুধু, মন ত' দেখো না
কি জ্বালাতে জ্বলে' যায় !

মদ খাই,—লাজ নেই,
কোথা ওমরের পানের পাত্র
প্রাণ মরে ভেবে' সেই।

মদ খাই ?—খাই, আরো খাব আমি,
এ ত' জানা-কথা খাঁটি ;
হে পথিক, তব পথের কিণারে
আছে ত' মদের ভাঁটি ?
মিছা মোরে দোষ'—এই দুনিয়ায়
কে সে আছে কোথা মদ নাহি খায় ?
নিখিলের প্রাণে 'কালিফ্ এজিদ'—
পেয়ালা-পূরিত 'খাঁটি'।

কোন্ মদ ভালো ভাই ?—
আনাক্রেয়ণ বেঁচে' র'ত যদি
শুধাতাম তারে তাই।
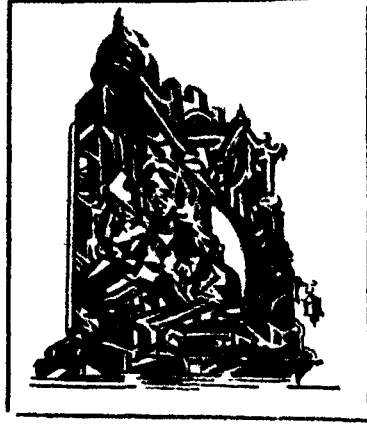
যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

দোতলার গাড়ী বারান্দাব একধারে একখানি ইজি চেয়ারে বসে অবিনাশ বাবু গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন এবং চশ্‌মাটি নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে সকালের ইংরেজী খবরের কাগজখানি পড়ছিলেন।

একটি ছিপ্‌ছিপে গড়ন গৌরবর্ণ মেয়ে এসে তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল। বয়েস তার বছর উনিশ হবে, কিন্তু তার চোখেও চশমা, একখানি সরু পেড়ে খদ্দরের সাড়ী, গায়ে খদ্দরের হাফ্‌-হাতা কলারওলা শেমিজ; দু হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি চিক্ চিক্ করছে। কালো চুলের রাশি এলো হয়ে তার পিট ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে। কাল চোথ দুটি থেকে প্রতিভার আলো যেন চশমার আবরণ ভেদ করে বিকীর্ণ হচ্ছে।

অবিনাশ বাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে একবার পিছন দিকে ফিরে দেখে বল্লেন—কি মা উমা, খবর কি? আজ যে বড় এর মধ্যেই পূজা পাঠ শেষ করে এলি?

—ভাল লাগছে না বাবা, দাদার জন্য মনটা এমন উতলা হয়ে রয়েছে যে, কিছুতেই স্থির হয়ে পূজায় বসতে পারলুম না।

—সে কি মা? দেবতার চেয়ে তোর কাছে মানুষ বড় হলো?—

—মানুষের চেয়ে বড় দেবতা যে কখন চোখে দেখিনি বাব?—

—চোখে তো ভগবানকেও দেখা যায় না মা, তা বলে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা মানবো না?

—ভগবানকে দেখতে না পেলেও তাঁর অস্তিত্ব যে আকাশে বাতাসে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে আমরা দেখতে পাই বাবা, তাই ত তাঁকে অস্বীকার করবার উপায় নেই আমাদের!—

—বাঃ তোরই শিক্ষা সার্থক হয়েছে দেখছি! ছোঁড়াটা কেমন বিগড়ে গেল! হ্যাঁ, গীতার সেই শ্লোক ক'টা একবার তেমনি সুর করে বল্ তো মা শুনি, তোর মুখে সংস্কৃত আবৃত্তি আমার শুনতে ভারি ভাল লাগে। সেই যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে যে, তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বভাবে বিরাজ করছেন—

—যখন তখন কি গীতা আওড়াতে ভাল লাগে বাবা? ও সব সূক্ষ্ম জিনিষ; যখন বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় থাকা যায় তখনই লাগে ভাল; তুমি দাদার একটু কিছু সুখবর এনে দাও, গীতা কেন সমস্ত ভাগবতখানা আমি তোমাকে পড়ে শোনাবো—

—ওরে আমি কি খোঁজ করতে কিছু বাকী রেখেছি!

এতক্ষণ তার সন্ধানে সমস্ত দেশ তোলপাড় হচ্ছে, অর্থব্যয়ে যতদূর হওয়া সম্ভব আমি তার ব্যবস্থা করেছি উমা !—

—তবুও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না আজও ?

—না মা।

—তাহলে কি হবে বাবা, মা যে আজ ক'দিন ধরে কিছুই দাঁতে কাটছেন না, তাঁর চোখের জলেরও যে বিরাম নেই।

—কি করবো মা, সে তো আর আমার অপরাধ নয়—

—কিন্তু, আপনার কি একবার তাঁকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিতে তাঁর কাছে যাওয়াও উচিত নয় ?

—আমি যে আজ আর তার কেউ নই মা, সন্তানই আজ তার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়তম ! তাই সে অনায়াসে আমাকেই অপরাধী বলে অনুযোগ করছে ! শুনিস নি ? সেদিন স্পষ্টই বললে যে, তোমারই জন্ম আমি ছেলেকে হারালুম ! আমার নিষ্ঠুরতার মর্ম্মাহত হয়েই বাছা তার না কি বিবাগী হয়ে গেছে, এই তোমার মায়ের অভিযোগ উমা !

—এ অভিযোগ কি একেবারেই মিথ্যা বাবা ? অপনার দায়িত্ব কি এতে কিছুমাত্র নেই ব'লতে চান ?—

—তুইও ও কথা বলিসনি উমা, তোর মা যা ব'লতে ইচ্ছা করে বলুক, সে যে তার শিক্ষার অভাব জনিত নির্ব্বুদ্ধিতা সে জানি আমি কিন্তু তোমার তো এ কথা বোঝা উচিত মা, যে, কারুর পক্ষেই কর্ত্তব্য পালন করাটা কোনও দিনই অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে না।—

—সে কি আমি বুঝিনি বাবা ? কিন্তু গোল বেধেছে যে, আপনার ওই 'কর্ত্তব্যটা' নিয়ে ! আমার বাচালতা মার্জ্জনা করবেন, আমি তো বুঝি সন্তান যাতে সুখী হয় শান্তিতে থাকে সেইটে দেখাই পিতার প্রধান কর্ত্তব্য।

—নিশ্চয়, আমিও তো তাই মনে করি উমা, আর সেই জন্যই ত তোমার দাদার বিবাহ আমি ওখানে কিছুতেই দিলুম না। এক দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টারের মাতৃহীনা কন্যাকে এনে আমি এই প্রকাণ্ড রায়-পরিবারের ভবিষ্যৎ গৃহিনীর পদে প্রতিষ্ঠিত করলে যে আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করা হতো মা।

—কেন বাবা, আপনার এরকম মনে হবার কারণ তো আমি ঠিক ধ'রতে পারছিনি।

—আমি তোমায় বুঝিয়ে বলছি শোনো। সে মেয়েটি যে আবেষ্টনের মধ্যে বেড়ে উঠেছে—যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তার জীবন গড়ে উঠেছে, আমাদের পরিবারের আবহাওয়া তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের আচার-ব্যবহার চাল-চলন ও আদব-কায়দা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; শুধু তাই নয়, নিয়ত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র সংসারের মধ্যে মানুষ হওয়ার ফলে এমন একটা নীচ সঙ্কীর্ণ ও অনুদার স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রকৃতিগত হ'য়ে পড়ে যে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে সহসা একদিন তাকে টেনে নিয়ে এলে সে নিজেকে কিছুতেই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চ'লতে পারে না ! গরীব ইস্কুল মাষ্টারের দুঃখী মেয়েটি —কোনও দিনই জমিদার অবিনাশ রায় চৌধুরীর উপযুক্ত পুত্রবধূ হ'য়ে উঠতে পারবে না, এ জেনেই আমি এ বিবাহে সম্মতি দিই নি। তাকে নিয়ে এলে কিছুতেই ভবিষ্যতে রায়-পরিবারের কল্যাণ হ'ত না এবং তোমার নির্ব্বোধ দাদাও কখনই সুখী হ'তে পারতো না।

—রাগ করবেন না বাবা, কিন্তু এ সমস্তই আপনার অনুমান মাত্র। আপনি তাকে দরিদ্রের কন্যা ব'লে যতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌ছেন, তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে বোধ হয় আপনার এ ভুল সংশোধিত হ'তে পারতো ! বাবা, সংসারে বৈষয়িক দারিদ্র্যই মানুষের চরম দরিদ্রতা নয়। আমি তো মনে করি—অন্তরে যে দীন, ভিতরে যার অভাবের অন্ত নেই, ধনকুবের হ'লেও সে-ই যথার্থ দরিদ্র,—হৃদয়ের যার প্রসারতা নেই, সে-ই প্রকৃত নিঃস্ব। প্রকৃত দুঃখী ! এই বিভা মেয়েটিকে আমি ছেলে-বেলা থেকেই জানি, আমাদেরই ইস্কুলের নীচের ক্লাশে সে পড়তো, সে যে অন্তর-ধনে অমিত ধনী ! নিজের জল-খাবারের পয়সায় সে নিজে না খেয়ে তার চেয়েও দরিদ্র যে সব মেয়ে, তাদেরই ডেকে নিয়ে খাওয়াতো, যার বই নেই—তাকে সে নিজের বইখানি পড়তে দিতো—যার শ্লেট ছিল না, তাকে সে নিজের শ্লেটে লিখতে দিত কারুর সঙ্গে কখনও একদিনের জন্যও তার ঝগড়া হয় নি।

বড় মিষ্টভাষিনী মেয়ে সে, কখনও মিছে কথা বলতে জানতো না, কখনও কোনও হীনকাজ সে করেনি। ভারি মধুর স্বভাবটি ছিল তার। বধূরূপে তাকে আজ পেলে রায়-পরিবার ধন্য হ'য়ে যেতো বাবা। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বলে আভিজাত্য গর্ব্ব ও বংশ-মর্য্যাদার মিথ্যা অভিমানে কি রত্ন যে আপনি হেলায় হারিয়েছেন, সে আপনি জানেন না। স্বীকার করি, তার পিতা দরিদ্র, কিন্তু বিদ্যা বৈভবে বহু ধনী যে তাঁর কাছে দীনের চেয়েও দীন! অবশ্য শিক্ষকতা ক'রে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু সেটা কি হীন উপজীবিকা? শিক্ষক বলে তিনি ত' ভিক্ষুক নন! এই তো দেখলেন, কন্যাদায়গ্রস্ত হয়েও আপনার অযাচিত অর্থসাহায্য তিনি সেদিন হেলায় প্রত্যাখান ক'রে যে তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় দিলেন, আপনাদের অনেক ধনী অভিজাতেরই সে গুণ নেই!—দুর্ভাগ্য আমার দাদার, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এমন একজন মহৎ চরিত্র লোকের সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়েকে পেয়েও আমাদের হারাতে হ'লো,—শুধু আপনার অন্যায় জেদের জন্যে!

—এসব কথা তুই আমায় আগে বলিস্ নি কেন উমা?

—আগে বললে কি আপনি শুন্‌তেন? যখন জানতে পারলুম যে, আমার মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপরোধ কাকুতি মিনতিতেও আপনি কর্ণপাত করেন নি, যখন শুনলুম যে, মাষ্টার মশাই উপযাচক হ'য়ে এসে আপনাকে একবার তার কন্যাটি দেখে আস্‌বার জন্য প্রস্তাব ক'রে অপমানিত হ'য়ে ফিরে গেছেন—তখন আর আপনাকে কিছু বলতে আস্‌তে আমার সাহস হ'ল না!

—তখন এসে তুই এসব কথা ব'ললে আমি হয়ত অনুমতি দিতে পারতুম।

—বোধ হয় পারতেন না বাবা, বোধ হয় কেন, নিশ্চয় দিতেন না—সে দিন তো আর আপনার একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাওয়ার এই নিদারুণ দুর্ঘটনা আপনাকে এতটা দুর্ব্বল ক'রে ফেলতে পারেনি! আপনি বাইরে যতই কেন স্থির ধীর গম্ভীর ও অবিচলিত হ'য়ে থাকবার চেষ্টা করুন না কেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভিতরে আমাদের কারুর চেয়েই আজ আপনি কম কাতর নন!

—সে কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

ভারি গলায় এই কথাগুলি বলতে বলতে অবিনাশবাবু কোঁচার কাপড়ে তাঁর জলে ভ'রে উঠা চোখ দুটি মুছে ফেলতে যাচ্ছিলেন, উমা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলে পিতার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, নিজেরও ভিজে চোখ দুটি মুছে নিয়ে তাঁর হাত দুটি ধীরে সাদরে বললে—এস বাবা,—উঠে এস, একবার আমরা মা'র কাছে যাই চল'!

কন্যার কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ীর ভিতর যেতে যেতে অবিনাশ বাবু একটা আক্ষেপের গুরু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ঈশ্বরের কাছে জন্মান্তরে না জানি কত অপরাধই করিছিলুম মা, নইলে আমার এই গৌরী প্রতিমা তা'র বোধনের উষায় এমন তাপসী উমার মতো নিরাভরণা হ'য়েছে, এও দেখতে হ'লো—আমি যে অনেক খুঁজে অনেক দেখে আমার জামাই করিছিলুম—একেবারে স্বাস্থ্য ও শক্তির আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি—সেই শূরবীর—" পিতার হাতটি নিজের কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে উমা বললে—আপনি যদি চুপ করে না চলেন, তাহলে কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না বল্‌ছি!

(৪)

বিভার অন্যত্র বিবাহ হ'য়ে গেল—এরই জন্য আশাভঙ্গের মনঃক্ষোভে যতটা না হোক্,—প্রকাশ দূরে পালিয়ে এসেছিল তার পিতার উপর প্রচণ্ড অভিমান করে।

নইলে, বিভার বিবাহের দিন পাষাণে বুক বেঁধে সে তো মাষ্টার মশাই-এর বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েছিল। 'মাল-কোঁচা' বেঁধে সে বরযাত্রীদের সকলকে পরিবেশন ক'রে খাইয়েছে, ক'নের পীড়ি ধ'রে দৃঢ় অকম্পিত করে—সাতপাক ঘুরিয়েছে—নিজে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্প্রদান থেকে শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত অশ্রুহীন চক্ষে সে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এমন কি বিভার বরকে সে সহাস্য মুখে বয়স্য-যোগ্য ঠাট্টাও দু'একটা ক'রেছিল, তাই পরের দিন বিভা যখন বিদায় নিতে এসে চোখের জলে তার দুটি পা' ভিজিয়ে দিয়ে

বললে—আশীর্ব্বাদ ক'রো যেন তোমারই মতো মনের বল নিয়ে জন্ম-এয়ো-স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর ঘর ক'রতে পারি!—এতদিন আমরা ভুল ক'রে খেলা-ঘরের বর-ক'নে সেজেই কাটিয়েছি—আজ সে স্বপ্নঘোর দূরে সরে গেছে, আজ আমরা দু'টি ভাই-বোন পরস্পরকে যেন এই প্রথম চিনতে পারলুম—এই বিবাহ-সভায়—এই আমার কুশণ্ডিকার হোম শিখার তপ্ত আলোয়! আমার ভাই নেই, আমার দাদা বলবার কেউ ছিল না, তাই ভগবানের মঙ্গলহস্ত এই দুঃখের ভিতর দিয়েও আজ নূতন ক'রে তোমাকে আমায় ফিরিয়ে দিলেন। আজ থেকে তুমি আমার ভাই, আমার দাদা!

যে গাড়ীতে বরক'নে গেল, প্রকাশ সেই গাড়ীতেই তাদের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে বিভাকে রেলে তুলে দিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। পরের ট্রেনে সেও দেশ-ছাড়া হ'য়েছিল।

প্রকাশ ট্রেনের যে কামরাটিতে গিয়ে উঠেছিল, ট্রেন ছাড়বার একটু পূর্ব্বে মহাকলরবের সঙ্গে ছুটাছুটি ও হুটোপাটি করতে করতে একদল ছোকরা সেই কামরায় উঠে পড়ল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এতগুল বাক্স, বিছানা, 'সুটকেস', 'ট্রাঙ্ক' প্রভৃতি গাড়ীর ভিতর এসে ঢুকল যে, প্রকাশ তাঁদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলে না যে, তাঁরা এত লটবহর নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

তাদেরই মধ্যে একটি ছোকরা মাথায় তার একরাশ উস্কো খুস্কো কালো চুল, একটু বুক চিতিয়ে, বাঁয়ে খানিকটা কার্ণিক খেয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললে—এই সহজ ব্যাপারটা আর ধ'রতে পারলেন না মশায়? ঐ সব 'ট্রাঙ্কের' গায়ের 'লেবেলগুলোর' দিকে একটু কৃপাদৃষ্টি করলেই তো অধীনদের গন্তব্য স্থানটা কোথায় চট্ করে জানতে পারতেন!

প্রকাশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল! সত্যিই ত ট্রাঙ্কের গায়ের কাগজের লেবেলগুলোতে ছাপার হরফে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে "Howrah to Jaipur." তার নীচে আরও এক লাইন ছাপা আছে—"The Eastern Cinema Syndicate Ltd." 'লেবেল' থেকে যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তা'তে প্রকাশ বুঝতে পারলে যে, এরা একটি চলচ্চিত্র সম্প্রদায়ের লোক, কলিকাতা থেকে জয়পুরে চলেছে।

সেই বুক চেতানো কার্ণিক খাওয়া ছেলেটি এবার প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলে—মহাশয়ের কোথা যাওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি?

প্রকাশ কি বলবে ভেবে কিছু স্থির করতে না পেরে বলে ফেললে—আমি ঠিক কোথাও যাচ্ছি নি।

প্রকাশের এই উত্তর শুনে সমস্ত গাড়ীখানি মুখরিত করে একটা হাসির হর্‌রা উঠে গেল। গোঁফ দাড়ি কামানো রোগা মতন একটি ফর্সা ছেলে জিজ্ঞাসা করলে—সে কি মশায়? ট্রেনে চড়ে চলেছেন অথচ কোথাও যাচ্ছেন না কি রকম?

এই সময় ল্যাভেটরীর দরজা খুলে একটি লম্বা দোহারা চেহারা শ্যামবর্ণ ছোকরা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—ব্যাপার কি? সহসা এত অট্ট হাস্যের রব উঠল কেন?

ইনি গাড়ীতে উঠেই ল্যাভেটরীর মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সুতরাং ব্যাপারটা কি হয়েছে কিছুই জানতেন না। সেই বুক চেতানো কার্ণিক খাওয়া ছেলেটি থিয়েটারী ঢঙে প্রকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হেসে বললে যে, উনি যে কোথাও যাচ্ছেন না এই অসম্ভব কথাটা কি তুমি বিশ্বাস করতে পারো সিধু? গাড়ীতে আবার একবার হাসির রোল উঠল। সিধু প্রকাশকে দেখেই একগাল হেসে বলে উঠল—আরে কেও প্রকাশ যে! বলতে বলতে সিধু প্রকাশের কাছে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তার কাঁধে হাত দিয়ে পাশে বসে পড়ল।

—তারপর প্রকাশ, কেমন? আছিস্ কেমন? অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, ইস্কুল ছেড়ে পর্য্যন্ত আর বড় একটা কারু সঙ্গে দেখাই হয় না। কি করছিস্ এখন? কোথায় চলেছিস্? বিয়ে-থা করেছিস্?

প্রকাশ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে যখন সিধুকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে ভালই আছে, সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার এখনও ঘোচেনি, এম. এ. আর ল. পড়ছে, বিবাহ এখনও করেনি এবং করবার ইচ্ছেও নেই, আর তাই নিয়েই বাড়ীতে রাগারাগী হওয়াতে সে বাড়ী থেকে পালাচ্ছে, তার বাবার

কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, সে এখন একরকম নিরুদ্দেশের যাত্রী! সিধু তখন প্রকাশকে পরম উৎসাহেই এক প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে বলেল—ভালই হয়েছে, তুই চল্ আমাদের সঙ্গে জয়পুরে। আমরা সেখানে ফিল্ম্ তুলতে যাচ্ছি। মাস দুই তিন থাকবো, তোফা থাকবি আমাদের সঙ্গে—

গাড়ীসুদ্ধ সকলে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে বেশ হবে, চলুন চলুন, আমাদের সঙ্গে চলুন।

সেই বুক চেতানো কার্ণিক খাওয়া ছেলেটি এতক্ষণ এক দৃষ্টে প্রকাশের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়েছিল, সে এবার দুই হাতে সজোরে এক তালি মেরে বলে উঠল—বাস্! খোদা জুটিয়ে দিয়েছেন, ঠিক যেমনটি খুঁজছিলুম আমরা সিধু! এ ভদ্রলোকের একেবারে Typical Cinema Face! প্রকাশ বাবুকেই আমাদের Hero সাজানো যাবে, কি বলিস্?

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করলে। সিধু উঠে সেই বুক চেতানো কার্ণিক খাওয়া ছোকরার পিঠে সাহ্লাদে তিন-চার চাপড় মেরে বলেল—ঠিক বলেছিস্ বাঁকা, তোর চোখ আছে স্বীকার করলুম!

তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেল যে, প্রকাশকেই তাদের ফিল্মে 'হিরো'র ভূমিকা নিতে হবে, অথচ প্রকাশ তা গ্রহণ করতে সম্মত আছে কি না এ কথাটা কেউ একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলে না।

বাঁকা এগিয়ে এসে এবার প্রকাশের ডান হাতখানা বাগিয়ে ধরে বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়ে শেকহ্যাণ্ড্ করে বললে—আজ থেকে আপনাকে আমাদের দলে ভর্ত্তি করে নেওয়া হলো।

হাতের ঝাঁকুনী থেকে প্রকাশ বুঝতে পারলে যে, এই বাঁকা ছেলেটির গায়ে বিলক্ষণ জোর আছে। সে তার মুখের দিকে চেয়ে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সিধু তার আগেই বললে—ভয় নেই, তোমাকে আমরা অমনি খাটিয়ে নেব না, তুমি এ জন্যে বেশ মোটা টাকা পাবে।

গোঁফ দাড়ি কামানো রোগা মতন সেই ফর্সা ছেলেটি বললে—যখন এমন অভাবিত রূপে আমরা আমাদের ছবির নায়ক পেলুম, তখন আমি প্রস্তাব করি যে, এঁর সম্মানের জন্য এসো একটু গাড়ীর মধ্যেই আনন্দ করা যাক্।

বাঁকা উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললে—আমি ভুলুর এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি!

সিধু বললে—তা তো তুমি করবেই। যে কোনও ছুতায় এক-আধ পাত্র টানবার সুযোগ তুমি কবে না আর সমর্থন করো বলো, কিন্তু কথা ছিল যে গাড়ীতে কেউ টানবে না, সেটা মনে আছে?

ভুলু বললে—কিন্তু সে কথা তো আর টেঁকছে না সিধু, অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে আনন্দ প্রকাশের জন্য আমাদের একটু পান করা যে এখন কর্ত্তব্য দাঁড়িয়ে গেল।

বলতে বলতে একটা 'সুটকেস' খুলে ফেলে সে একটি হুইস্কীর বড় বোতল ও গোটা দুই তিন গ্লাস বার ক'রে ফেললে এবং বাঁকাকে হুকুম করলে ice vendor (আইস ভেণ্ডর)-এর কাছ থেকে এক ডজন 'সোডা' আনিয়ে নিতে।

বাঁকা তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল ক'রে ফেললে। একটি গেলাশে হুইস্কী আর সোডা ঢেলে ভুলু প্রথমেই প্রকাশকে দিতে গেল, প্রকাশ হাত জোড় করে বললে—ও রসে আমি বঞ্চিত, আপনারা চালান ফুর্ত্তি করে, আমার কোনও আপত্তি নেই!

সিধু প্রকাশের পিঠ চাপড়ে বললে—বাঃ বেশ, বেশ, তুমি দেখছি এখনও সেই ভালছেলেটি হ'য়েই আছো। আমরা দাদা, জানোই তো একেবারে গর্ভ-বকাটে! শহরে থাকলে অবশ্য পাল-পার্ব্বণ ছাড়া চলে না, কিন্তু ট্রেনে ক'রে বিদেশ যেতে হ'লে ওটা—আমরা ওটা—গাড়ী থেকেই প্রায় সুরু করি!—আর,—যতদিন না টাকার টান পড়ে, 'বুঝলে কি না' ততদিন চালিয়ে যাই!—হাঃ হাঃ হাঃ! কি জানো ভাই, বিদেশ বিভূঁয়ে চলেছি, একটু আনন্দ না করলে টেঁকবো কেমন করে? আর এই তো দেখ্ছ দাদা, মানুষের মুরদ, আজ আছে কাল নেই!

বাধা দিয়ে ভুলু বলে উঠল—

"এই তো জীবন, মানব জীবন
ফুল ফোটা—ফুল ঝরা!"

ক'দিনের জন্যই বা আসা! একটু হেসে খেলে স্ফূর্ত্তি করে কাটিয়ে দেওয়াই ভাল!

বাঁকা বললে—যা বলেছো ভুলু, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট—এ সব তো নিত্যই আছে, তার মধ্যে যে ক'টা দিন ফাঁকি দিয়ে একটু আনন্দ করে নিতে পারা যায়—সেইটুকুই আমাদের লাভ!

"—জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে,
পাত্রখানি নাও ভ'রে নাও নিবিড় অনুরাগে!"

এই হ'চ্ছে আসল দার্শনিকের মতো কথা।

বলা বাহুল্য যে, পাত্রের পর পাত্র হাতে হাতে ঘুরে তখন নিঃশেষিত হ'তে সুরু হয়েছে! সুরার উগ্র সুরভির তীব্র আঘ্রাণ পাশের গাড়ীতে পর্য্যন্ত চলন্ত ট্রেণের দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে!

—ক্রমশ

কবেকার কথা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সুন্দর বরাঙ্গ তব, মোর তনুলতা,
বলেছিল সে যে কোন্ কথা,
দোঁহাকার কানেকানে, কবে কোন্ যুগে?
তাই কত সুখ আর কত দুঃখ ভুগে
মিলন হয়েছে বারবার, ছাড়াছাড়ি
তাও হল, তবুও তো ভুলিতে না পারি,
আবার মিলন খোঁজে আকুলতাময়,
সে কি তবে ইষ্ট মন্ত্র, কান-কথা নয়?
অনিবার জপিবার জনমে জনমে,
প্রাণ চাহে, মন যারে নমে'!
সেই কবেকার প্রেম, হয় না নিঃশেষ,
এ যেন গো কুসুম নিমেষ
বসন্তের বনে, যার মেটে না ক' আশা
আলোকের মুখ চেয়ে, যার ভালবাসা

কেবলি উথলি ওঠে সুরভি পবনে,
বরষে বরষে আসে বসন্তের সনে,
বহে বুকে পরশের ব্যাকুল বাসনা,
পড়ে থাকে পথ চেয়ে "আস না", "আস না"
কেঁদে বলে, আঁখি মেলি দরশের লাগি,
বিভাবরী ভোর করে জাগি।
যুগান্তরে যেই মন্ত্র দিয়েছিলে কানে,
আজিও চলেছি তারি টানে,
কতবার নিবেদন করেছি না জানি,
আমার এ দেহমন, সোহাগের বাণী,
আমার এ যৌবনের বনফুল যত;
তোমার মুঠার মাঝে কেবলি নিয়ত,
কত নিলে, কত দিলে, কত গেল ঝরে,
কখনো আবেশে, কভু বহু সমাদরে
মিলনের মধুমেলা, বাসর ফুলের;—
সে কি কভু শুধু এ কূলের?

তোমার চোখের ভাষা, মৌন অর্থ তার,
মুহূর্ত্তে যে দিব্য পরিষ্কার,
ও হাসির জানি মর্ম্মবাণী, পরশের
মালিকা বহিয়া, শুধু খুঁজি দরশের
অবসর, জীবনের রহস্য আগার,
তুমি এসে খুলে দিয়ে যাও বারবার।
আবার আসিবে জানি, পথিক দোসর,
বিরহ, মিলন রাতি, ফুলের বাসর
কিছুই হবে না মিছে, স্বপ্ন পাবে কায়া,
মিলাইবে মরীচিকা মায়া।

—০—

জন্মান্তর

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

জমীদার বাড়ীর পাশেই খানিকটা জায়গা দু'ভাগ করিয়া টীনের চাল দিয়া ছাওয়া। গাঁয়ের বাজার বসে সেই দুটারই ভিতর। ছাউনির বাহিরে মানুষ আনাজ-পাতি লইয়া বসিয়া থাকে। রৌদ্রের তাপ হইতে মাথার খুলিটাকে বাঁচাইবার জন্য ভিজা গামছার প্রলেপ কিম্বা রং-চটা ছাতা মাথায় দেয়।

মাছের বাজার ঘেঁড়িয়া ঝাঁকরা অশথটার তলায় এক বুড়ী একটুকরা কাপড়ে খানিক খানিক নূতন এবং পুরানো তেঁতুল, আর মটর-কলায়ের বড়ী লইয়া বসে। তা'র অদূরে দুটা বাঁশের খুঁটার উপর হোগলার চাল্ ফেলিয়া রতন তা'র মনোহারীর দোকান করিয়াছে। পান-তামাক হইতে কানপুরের পাঁপর, বটকেষ্ট পালের টনিক, ডি গুপ্ত— সবই তার দোকানে কিছু কিছু মজুদ থাকিত। বিক্রীও হইত খুব।

এটা সেটা লইয়া বুড়ীর সহিত রতনের যেদিন ঝগড়া না বাধে, রতনের সেদিন দোকান করা ঠিক জমে না। রতন তামাসা করিয়া বলে, কোঁদল না করলে বুড়ীর বুঝি বিক্রীর সুবিধে হয় না?

বুড়ী ক্ষেপিয়া উঠে, কি করি বল্ বাছা, কুঁদুলে নাড়ী কট্ কট্ করে। তুই আমার কোঁদলের বড় যুগ্যি কিনা! তাই—হাড়হাবাতে মিন্‌সে...

—বাড়ীতে কোঁদলের সুবিধা হয় না? সব মরে হেজে গেছে বুঝি? তাই বাজারে আসিস্ ঝগড়া করতে? ঐ যে কথায় বলে না, 'সখিলো সখি, সাজালো ঘোঁড়া'— তোর দেখি তাই...

বুড়ী হঠাৎ কেমন হইয়া যায়, ছেঁড়া ময়লা কাপড় দিয়া বার বার চোখ ঘসিতে থাকে। রতনের তামাসা করা শেষ হইয়া যায়; বলে, তামাসা বুঝিস্ না বুড়ী। সেই তামাসা—

কান্না থামাইয়া বুড়ী বলে, বুঝি বাবা, বুঝি। ভগবান অনেক তামাসাই ত' করলেন! কিন্তু আর যে সহ্য করতে পারি নে ..

বারটার পর জমীদার বাড়ীর লোক বাহির হয়। দোকানীদের সাধ্যমত বা অসাধ্য হইলেও 'তোলা' দিতে হয়।

বেঁটে বুড়ো মানুষটি; ফর্সা চাদর ঝুলাইয়া প্রত্যহ বাজারে আসেন; পিছনে আসে বড় ছেলেটা কাঁকালে এক প্রকাণ্ড ধামা লইয়া। সামনের মানুষটিকে পয়সা দিতে হয়, পিছনে আনাজ।

রাজবাড়ীর 'সুবলচাঁদ বাবু', না দিলে চলে না। হরিপ্রিয় ছেলের সঙ্গে ওপ্রান্ত হইতে বাজারের শেষ কোণে অশথ-তলায় আসিয়া পৌঁছাল—বুড়ী ও রতনের দোকানে। সুবলচাঁদ বাবুকে দেখিলে বুড়ীর মাথা ঘুরিয়া যায়—পয়সা দিতে হইবে! যেদিন বিক্রী থাকে না সেদিন কিছু বলিবার আগেই রতন বুড়ীর পয়সাটা সুবলচাঁদ বাবুর হাতে গুঁজিয়া দেয়।

বুড়ী এক এক দিন আপন মনে বলে, না বাবু, দোকান পাত্‌ব আমি, পয়সা দেবে অন্যে! কাজ নাই আমার হাট করায়।

রতন শুনিতে পাইলে বলে, বুড়ো শিবের দিব্যি বুড়ী। না এলে মাথা খাবি। তো' বিনে আমার খদ্দের জুটবে না।

—শোন কথা! পাড়ার লোকে দুটি সন্ধ্যে গাল দেয় 'নখের মা'। সব খেয়ে বসে আছি— তার পর চোখের উপরকার বেলের মত আঁচিলটা দেখাইয়া বলে, খেয়ে খেয়ে সব এইখেনে জমা করেচি রতন, ভাতার-পুত—সব। ঐ পিণ্ডি দেখলে গাঁয়ের লোকের সেদিন আর পিণ্ডি জোটে না।

—আমার জোটে বুড়ী, তুই রোজ আসিস। ঝগড়া ঝাটির মধ্যে তোকে কেমন যেন ভালবেসে ফেলেচি—সত্যি—

মর্‌ মর্‌, নেটোপনা করিস নে। বজ্জাৎ ছোঁড়া—

বুড়ী আবার রাগিয়া উঠে।

রতন হাসিয়া বলে, মোতমদ্দানির দিব্যি, রাগ করিস না, আমার ঠাকুমাটা ছিল এক্কেবারে তোর মতন! অমনি আঁচিল, অমনি বুড়ীপনা...কপিকল!

আশ্বস্ত হইয়া বুড়ী বলে, আ হরি! আমি ভাবি—দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলে। গালের মাংসটা দেখায় জীর্ণ কোঁচান ময়লা কাপড়ের মত। সেই জীর্ণ লোল রেখা-বলির মধ্যে দীর্ঘ অতীতের অশ্রুময় কাহিনী গোপন থাকিয়া যায়।

কখনো ভাব, কখনো ঝগড়া। এই ভাবেই দিন যায়। হাটেই আলাপ; হাট ভাঙিলে বুড়ী চলিয়া যায়। পরদিন হাট বসিবার আগে আর দেখা হয় না।

ভোর হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। বুড়ীর গাছতলায় সে দিন আর একটি নতুন মেয়েকে দেখা গেল। ধূলায় কাদায় লাল পাড় কাপড়টার প্রকৃত রংটা বেমালুম লোপ পাইয়া গেছে; মাথার চুল জট ধরিয়াছে; দেখিলেই মনে হয়, সে রাজ্যে বহুদিন চিরুণী জিনিষটি বিচরণ করে নাই। সেই রুক্ষ অবিন্যস্ত জটের অন্তরে একটি ম্লান সিঁদুর-রেখা ভস্মলতার অন্তরাল-প্রবাহিতা শীর্ণা তটিনীর মত লুকাইয়া থাকে। একটি ছোট চুপড়ি করিয়া সের পাঁচেক পটল এবং গোটাকতক কচি-উচ্ছে লইয়া সে বাজারে আসিয়াছে।

নতুন লোক, কেহই তার আনাজপাতি খরিদ করিল না।

রতন দোকান হইতে দেখিল, মেয়েটি বসিয়া কত কি ভাবিতেছে। বাজারে সে যে জিনিষ বিক্রী করিতেই আসিয়াছে, তাকে দেখিলে সে কথা মনেই হয় না। যেন বাজারভর্ত্তি এতগুলি লোকের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই তার আসা। রতন তার কাজের ফাঁকে দেখিল, উপরের আকাশের মত মন্থরতায় ভরা তার মুখখানিতে ক্ষণে ক্ষণে বর্ষণের আভাষ ফুটিয়া উঠিতেছে।

বৃষ্টিবাদলে বাজারে তেমন লোকসমাগম হয় নাই। হরিপ্রিয় সকাল সকাল কাজ সারিতে বাহির হইলেন। নূতন মেয়েটির নামধাম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটি তার নাম বলিল যতন। সে গাঙের ওপারের একটা গ্রাম হইতে হাটে আসিয়াছে। প্রশ্ন শেষে কাজের কথা আসিয়া পড়িল, সুবলঠ বাবু পয়সা চাহিলেন। যতন কহিল, পয়সা আমি আনিনি বাবু, জানতুম না।

হরিপ্রিয় বলিলেন, ঢং ক'রিস নি ছুঁড়ি, পেট-আঁচলে পয়সা বাঁধা— কথা শেষ হইব'র পূর্ব্বেই যতন বলিল, ওতে সবে দুটি পয়সা আছে বাবু। পারাণির পয়সা দুটি। এখুনি বাড়ী ফিরতে হ'বে, সোয়ামীর বড়—

হরিপ্রিয় পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, পারাণি ত' এক পয়সা, না রে?—দে, একটা পয়সাই দে'—

দোকান হইতে রতন বলিল, আজকের বর্ষায় গাঙ চওড়া হ'য়েচে, পারাণিও এক পয়সা বেড়েচে।

হরিপ্রিয় বলিলেন, কিন্তু পয়সা ওকে দিতেই হ'বে রতন। আজ যদি ওকে রেয়াৎ দিই, দেখাদেখি কালই দশজনে ঐ সুর ধরবে। তোরা হাটে আসিস্, জমিদারের আয় বাড়ে। আমার হাত দিয়ে তাঁর থলি ভর্ত্তি হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ'লেও আদায়ের যন্ত্র ছাড়া কিছু নই, মাফ্ করবার আনন্দটুকুও পাবার জো নেই।

বুড়ীর মেয়েটিকে ভাল লাগিয়াছিল, কহিল, আহা, আজকের মতন রেয়াৎ দিন বাবু, কাল দু দিনের পয়সা ও এনে দেবে। ঘরে ওর রুগ্ন সোয়ামী।

হরিপ্রিয় হঠাৎ উষ্ণ হইয়া বলিলেন, আমারই যত দোষ, না? জমীদার বুঝতে চায় না, সে কথা ভাবিস? আজ পয়সা নেব না, ব্যস—কালই জমিদারের কানে গিয়ে

উঠ্‌বে—কম বয়সের মেয়ে দেখে স্ববলন্ত পয়সা ছেড়ে দিয়েচে। আমার চাকরী ত খতম, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটারও—

রতন বলিল, কিন্তু জমীদারই বা বোঝেন না কেন? একদিন দুটো পয়সা কম্‌লে ক্ষীরখৈর ত' ঘাটতি হ'বে না!

—সে কথা খাসে গিয়ে বলিস রতন, এখানে নয়। দশ টাকা মাইনের চাকরকে বলে কোনো লাভই নেই। আমি বরং খাসে গিয়ে তোদের এই বদস্বভাবের এত্তেলা দিতেও পারি। বিশটি বছর এই করে আসচি, এই বাজার পত্তন হওয়া ইস্তক, চক্ষুলজ্জা আর করে না। দে', কে পয়সা দিবি দে'—

নতুন মেয়েটির পয়সা সে দিন রতনই দিল। কালো চোখ দুটি বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়া যতন তার অপরিচিত সাহায্য-দাতার মুখের দিকে চাহিতেই বুড়ী বলিল, তাক্ লাগারই কথা মেয়ে। ছোঁড়ার রীত্ ত জানো না, ওর কাজই এই।

কথা কহিবার মত মনের অবস্থা বোধ করি মেয়েটির ছিল না। আনাজ ভর্ত্তি ঝাকাটা মাথায় করিয়া সে যখন চলিতে শুরু করিল, ভাষার অতীত নীরব কৃতজ্ঞতা তখন তার দুটি চোখে অজস্র ধারায় উছলিত হইয়া পড়িয়াছে।

রতনের চোখে বাজারটা সহসা ফাঁকা হইয়া গেল। মেয়েটি কতদূর গেল বসিয়া বসিয়া তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। হয় ত এতক্ষণ গাঙ পার হইয়া চষা-মাঠের ছায়ায় ছায়ায় সে আপনার কুটীর-গৃহের উদ্দেশে চলিয়াছে। রতন সকাল সকাল দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল।

বিশেষ কোনো কারণ না থাকিলেও, রতন ভাবিয়াছিল, পরদিনও মেয়েটি নিশ্চয় বাজারে আসিবে। কিন্তু পরের দিন মেয়েটির কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। রতন অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।—এক দিনের তরে বাজারে রূপ দেখান'র কি দরকার ছিল বাবা!—

বুড়ী হাসিয়া কহিল, বাজে খরচ করলি এই ত!

রতন কথাগুলির অর্থ উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইল, বলিল, দুর্, তা নয়, বলছিলাম সে অন্য কথা—

—তাই বল্। কিন্তু তা'র সোয়ামীর যে ব্যায়রাম সেটা ভুলিসনে।

রতন কোনো কথা বলিল না। বুড়ীর কথার সত্যতা সে মনে মনেই উপলব্ধি করিল। বাজার ভর্ত্তি লোক, অতগুলো লোকের কোলাহল—এ সবের মধ্যে রতন আজ এতটুকু মাধুর্য্য খুঁজিয়া পাইল না। কেবলই মনে হইল, এ কোলাহল শূন্য, নিতান্ত নিরর্থক, এর কোনোই প্রয়োজন ছিল না। সে দিনও রতন দোকান বন্ধ করিল দু'পহরের আগে। বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

কিছু নয়, শিবতলায় পূজো দিতে যাব, মানত আছে—রতন জবাব দিল।

মানত ছিল না, কিন্তু মানত করিল, পূজা দিল। ঠাকুর-দেব্‌তার সহিত সম্পর্ক তার কোনো কালেই ছিল না। সেদিন শিবমূর্ত্তির পায়ে মাথা নোয়াইয়া সে বারবার কহিল, যতন আমার কেহ নয়, কিন্তু তার স্বামীকে তুমি ভাল করিয়া দাও। তুমি ত সত্যের দেবতা! ..

স্বামী নিরাময় হইলেই রতন আবার বাজারে আসিবে, এই কথাটাই তার কানে নীরব ভাষায় কে বার বার বলাবলি করিতেছিল।

পরদিন সত্যই যতন বাজারে আসিল। রতন বারবার শিববিগ্রহকে নমস্কার করিল, এবং দুই একটি পরিচিত লোককে যতনের খরিদ্দার করিয়া দিল।

মেয়েটি কথাবার্ত্তা বিশেষ বলে না। যা-ও বলে সে কেবল বুড়ীর সহিত। রতন মনে মনে রাগ করে, প্রথম সেদিন গাঁঠের কড়ি দিয়া স্ববলন্ত বাবুর হাত হইতে বুড়ী ত' রক্ষা করে নাই—তবে? একটা কৃতজ্ঞতার কথাও কি বলিতে নাই? আশ্চর্য্য বেহায়া মেয়ে! একহাট পুরুষের ভিতর পসরা নামাইয়া ছ' ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে লজ্জা করে না, তাহার সহিত কথা বলিতেই দুনিয়ার লজ্জা মাথায় ভাঙিয়া পড়ে? কিন্তু মুখে রতন কিছু বলে না। বুড়ীর হাত দিয়া গাদাগাদা আনাজপাতি নগদ দাম দিয়া আপনার জন্য খরিদ করে। বাজার ভাঙিয়া গেলে সেগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, কিম্বা সামনে কাহাকেও দেখিলে দিয়া দেয়। রাঁধিয়া এক মুঠি দিবার মত আপনার কেহ তার নাই।

বোষ্টম পাড়ার কাছাকাছি একটা ঘর লইয়া সে থাকে। যাহাদের বাড়ী, তারাই একবেলা দুইটি করিয়া রাঁধিয়া দেয়—পাঁচটি টাকার বদলে।

শনিবার রতন জিনিষপত্র খরিদ করিতে কলিকাতায় যাইত।

সেদিন রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, দোকান খুলিল না। যতন জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বুড়ী-মা, দোকানী কোথায়? এখনো যে ঝাঁপ তুললে না!

বুড়ী বলিল, কি জানি বাছা! কোথায় থাকে, কি করে, কার খুশীতে চলে বুড়ো শিবের বাবাও টের পায় না। নিজের মতগরেরই আছে। এইখানেই ত' খুনসুটি করতে করতে আলাপ, ঐ পর্য্যন্ত...

অসুখ বিসুখ করে নি ত'?

কি জানি বাছা, হ'লেও ত' জানতে দেবে না!

বে'থা করেনি বুঝি?

কে জানে! হয় ত করেচে, হয় ত করেনি। পরের দুঃখের ভাগও আগ্ বাড়িয়ে নেবে, নিজের জ্বালা যন্ত্রণা কারুকে জানাবে না।

দোকানীর ঘর কোথায়, কার কাছে সে থাকে, যার কাছে থাকে সে যত্ন-আত্মী করে কি না—মেয়েটির ইচ্ছা করিতেছিল সব কথা সে আজ, এই ফাঁকে শু'নিয়া নেয়। কিন্তু বুড়ী বিশেষ কিছুই জানে না, মেয়েটি ক্ষুণ্ণমনে চুপ করিয়া রহিল।

পর দিন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া রতন মেয়েটির সহিত কথা কহিল।

তোমার সোয়ামী—তিনি কেমন আছে?

পরপুরুষের সমুখে, বিশেষ এই লোকটির সামনে স্বামী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যতনের অন্তরের ভিতরটা কেমন একটা শূন্যতায় এবং লজ্জায় ভরিয়া গেল; ঠোঁট কাঁপিল, কথা ফুটিল না।

ভাল নয় বুঝি?

রতন তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না...!

দোকান হইতে গোটা দুই ছোট-বড় ওষুধের শিশি লইয়া রতন মেয়েটির হাতে দিল।

কলকাতায় গিছলুম, ঘুরতে ঘুরতে তোমার স্বামীর অসুখের কথা মনে পড়ে গেল। চিকিৎসে-পত্তরের জন্যেই ত মোট নিয়ে হাটে আসা।

নিতান্ত পর, সে দিনেরও অপরিচিত এই মানুষটির ব্যগ্র করুণায় মেয়েটির দুটি চোখ জলে ভরিয়া গেল। সত্যই ত! স্বামীর প্রাণটুকু বাঁচাইবে বলিয়াই ত' লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া সে হাট করিতে আসে! নহিলে এ কি তার কাজ! বাজারে ঢুকিতে প্রতিদিন তার পা কাঁপে, মাথার পসরা হেলিয়া আনাজ পড়িয়া যায়।

অতবড় বাজার, তার টীনের বড় বড় ছুটো চাল, অতগুলো ব্যস্ত লোক—যতনের অশ্রু-অস্পষ্ট চোখ হইতে সব নিঃশেষে মুছিয়া গেল। সামনের লোকটির মুখে অসহায় দুই দৃষ্টি মেলিয়া সে বলিল, কিন্তু এর দাম ত' আমার কাচে নেই! এ আপনি কেন আনতে গেলে? কলকাতার ওষুধের ত' ঢের দাম।

ঢের হ'ক, দাম তোমায় দিতে হবে না। আমার চেনালোকের ডাক্তারখানা, অমনি দিয়েচে—বলিতে বলিতে রতন দোকানে আসিয়া বসিল।

যতন-রতনের মাখামাখির কথাটা বাজারের মধ্যে অল্পক্ষণের ভিতরেই প্রচারিত হইয়া গেল। বিষ্টু ফোড়ে আসিয়া, হাসিয়া কাশিয়া, বিবিধ ভাব ভঙ্গী সহকারে বলিল, ভাল, ভাল রতন! শুনে খুশী হওয়া গেল! তাইত ভাবি, পুরুষমানুষ একেবারে—!

আপনার রসিকতায় বিষ্টু ফ্যা ফ্যা করিয়া হাসিতে লাগিল।

রতন কোনো কথা বলিল না। কড়ি বাঁধা হুকাটি লইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিল।

বিষ্টু কথাটা জমাইবার আশায় পুনরায় শুরু করিল, আমাদেরো একটু মনে রাখিস রত্না, বাজার সম্পর্কে তোর ঠাকুরদাদাই হই, কোনো পিতিবন্ধক নেই!

না। কিন্তু তোমার পটলের ঝাঁকা গরুর পেটে ঢুকল!— রতন আহারনিবিষ্ট গো-শিশুটিকে নির্দ্দেশ করিল। বিষ্টু গো-শাবকের উদ্দেশ্যে একটা গালি

উচ্চারণ করিয়া, দুইবার হেই হেই শব্দ করিয়া, হুকাটির প্রতি ব্যস্ত দুটি হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, দে ভাই দে, একটান্ মেরে যাই, সকাল থেকে একদম নিরম্বু।

রতন হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটি নামাইয়া নিঃশব্দে মেঝের উপর উপুড় করিয়া দিয়া কহিল, পুড়ে কাঠ হয়ে গেচে। পাল্‌টে সাজি, এসে খেয়ো।

অপমানে ক্রোধে বিষ্টু দোকান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

দোকানে গিয়া বিষ্টু বিড় বিড় করিতে লাগিল, নেটো বেটা! ওর জন্যেই ত' আমার আনাজপাতি নষ্ট হ'ল—দিক্ ও পাঁচসের পটলের দাম।...ও যদি মেয়েটার সঙ্গে না মেশে, আমিও তা হলে...আর জিনিষও অপচ' হয় না!...

শেষে কেহ যখন তার কথায় উৎসাহ প্রকাশ করিল না, তখন ঘোষণা করিয়া দিল যে, বিষ্টুপদ কর্ম্মকার—অনেক বেটা এবং বেটীকে সে দেখিয়াছে। রতনের দোকান পাট তুলিয়া সে যে বাপের বেটা তাহা প্রমাণ করিবে। তাহার মেজ ছেলে সুবলঠ বাবুর প্যায়দা—এই অবসরে সে কথাটাও কয়েকবার সর্ব্ব সমক্ষে শুনাইয়া দিল।

পরদিন মেয়েটি আর আসিল না।

বিষ্টুর সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্য রতন উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু বাজার খুঁজিয়া সে দিন আর বিষ্টুর সন্ধান মিলিল না।

রতন বুড়ীর নিকট গিয়া পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটি কেন এল না? তার নিজের ব্যবহারে ত' কোনো দোষ ছিল না!

বুড়ী ভিজা গলায় বলিল, কি জানি বাবা! মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিশতে দেখেছে কি অমনি চোখ টাটিয়েচে! মানুষের রীত্ এই। মেয়ে-পুরুষের ভিতরে যে কোন্‌খানটিতে ভাল'র বাসা বাঁধা থাকে তা' তারা জানে না রতন।

রতন বলিল, না বুড়ী, দোষ আমারই। নইলে সে হাটে আসা ছাড়বে কেন? নিশ্চয় কোনো...

না রে ক্ষ্যাপা, তোর আবার দোষ কি? বিষ্টু যে অপবাদটা ওকে দিলে তাতে কি ওর—

রতন কহিল, মিথ্যেকে ভয় করলেই সে লোকের চোখে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। তুমি ত' জানো, তার-আমার কিসের সম্বন্ধ? ভাই-বোনের চেয়ে এতটুকু খারাপ তা' নয়। তুমি জানো না বুড়ী, আমি কি ছিলাম!...তাকে দেখে কেমন হ'ল! ভাবলুম—সে আমার হীন রূপটা দেখবে—তা' আমি সহ্য করতে পারব না। তার চোখের আলোয় আমার ভিতরকার জানোয়ারটা মরে গেল। সে-ই তাকে— রতন কাঁদিয়া বুড়ীর কম্পিত লোল জানু দুইটার মধ্যে মুখ লুকাইল।

বুড়ী রতনের লম্বা তামাটে চুলগুলি লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে বলিল, দুঃখু করিস নে রতন, পুরুষ মানুষ তুই। মানুষ নিজের চোখ দিয়ে অপরকে দেখতে গিয়ে যত গোল বাধায়—তাদের কথায় শোক করতে গেলে দিন চলে না। একবার তার দুখের কথা ভাব্, তারও প্রাণ বুঝি তোরই মত—

সেদিন দুপহরে রতন বাসায় গেল না। এক আনার মুড়িফুলুরী কোঁচরে বাঁধিয়া সে খেয়াঘাটের উদ্দেশে চলিতে শুরু করিল।—

খেয়াঘাটের পথটায় বালি একটু বেশী। মধ্যাহ্নের তপ্তরৌদ্র সেই বিস্তৃত বালু স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। শুষ্ক শুভ্র বালুময় পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া নদীর গর্ভে হারাইয়া গেছে। মাঝে মাঝে দুই একটা নিষ্পত্র বিশুষ্ক গাছ মাংস লেশহীন কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া আছে।

মধ্যাহ্নের তপ্ত পথ রতনকে পীড়া দিল না; মুখে তুলিতে মুড়িফুলুরী পথের উপর ছড়াইয়া পড়িল, সেদিকে তার খেয়াল রহিল না। আলেয়া যেমন আলোর লোভ দেখাইয়া মানুষকে সুদূরে টানিয়া লইয়া যায়, পরিণাম ভাবিবার অবসর দেয় না, তেমনি প্রবল একটা কিছু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

খানিকটা হাটিয়া রতন তখন মিশনরী হাসপাতালটার কাছে আসিয়াছে, পিছনে একটা লোক দেখিয়া সে থামিয়া গেল। আধা-বয়সী একটা লোক, দাড়ি গোঁফের দু'একটা

চুলে পাক ধরিয়াছে। স্ব-রূপ ক্লান্তির মত, শূন্য ঝাঁকাটা মাথায় ফেলিয়া চলিয়াছে।

রতন প্রশ্ন করিল, কোন্ দিকে যাবে, কত্তা ?

—হবিপুর—মণ্ডলপাড়ার লোক আমরা, পার হ'য়ে ঘরে যাব।

রতন পুনরায় প্রশ্ন করিল, তোমাদের গাঁ থেকে আর কেউ আসে না ?

লোকটা জবাব দিল,—নবি সেখ্ প্যাঁজ বেচতে আসে, এক গাঁয়েরই লোক। তবে সব রোজ আসে না। বউটো সে দিন কলেরায় মারা গেচে দুটো কাচ্চা রেখে। তা সে দুটোরও সোয়াম—নবির এখন তাই ঝঞ্ঝাট অনেক—

এ সব বিবরণে তার প্রয়োজন ছিল না। নবি সেখের পত্নী-বিয়োগের দুঃখ তার কানে প্রবেশ করিল না। অন্তরটা এই শুষ্ক দু'পহর বেলার মতই উদাস হইয়া গেল।

উত্তরে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

খেয়াঘাটে পয়সা দিয়া লোকটা পারের নৌকায় উঠিতে-ছিল, রতন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, কত্তা, কোনো মেয়ে ওধারের গাঁ থেকে হাটে আসে বল্‌তে পারো ?

লোকটা প্রশ্ন শুনিয়া বহুক্ষণ রতনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, পরে একটু হতাশ ভাবে বলিল, আজ্ঞে না কত্তা, আমাদের গাঁ থেকে কোনো মেয়ে হাটে আসে না। তবে পাশের চয়না থেকে কটা মেয়ে লোক...

—তাদের নাম জানো ত' ?

লোকটা তাদের নাম জানিত না, বলিতে পারিল না। রতন কিন্তু নিরাশ হইল না। খেয়া-সরকারের ঘরে পারাণির পয়সা ফেলিয়া দিয়া নৌকায় উঠিয়া বলিল, চয়না গ্রামটি দেখিয়ে দিয়ো কত্তা, জল খেতে পয়সা দেব।

কত্তা উত্তর দিল, পয়সা লোব না কত্তা, হবিপুর-চয়নার তফাৎ দূর নয়—রশিটেক, তা আপনাকে দেখিয়ে দেব।

মাঠ-পথ ধরিয়া উত্তরে চলিয়াছিল।

আল্ বাঁধা, বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে গাছের ছায়ায় কৃষাণের দল মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে দল বাঁধিয়া কলিকা ফুঁকিতেছে। দূর বৃক্ষশ্রেণীর আড়াল দিয়া শব্দ সাড়া করিয়া কয়েকটি গো-শকট চলিয়াছে। মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া কখনো বা একজন কৃষক অদ্ভুত শব্দ করিয়া দূরের কাহাকেও ডাকিতেছে।

রতন ভাবিতেছিল, এই পথ দিয়া এমনি মাঠের পাশ দিয়া রতন প্রতিদিন পসরা মাথায় করিয়া আপনার গ্রামের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে—ধূলির বুকে সে পথ-রেখা অক্ষয় হইয়া নাই। থাকিলে সেই রেখা ধরিয়া সে আজ...

চলিতে চলিতে রতন জিজ্ঞাসা করিল, চয়না ফেলে আসিনি ত' কত্তা ?

এই ত সবে সাঁইপোড়ার নকুল পালের জোড়া মাঠ। হবিপুরই পেলাম না ত চয়না !

হবিপুর পার হইয়া রতনের ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। কত বড় উন্মাদ খেয়ালের বসে, মাঠ, গাঙ্ পার হইয়া আজ সে চয়নায় ছুটিয়া আসিয়াছে, ভাবিয়া প্রথম সে লজ্জায় মরিয়া গেল। চলার পথে পা ফেলার ভুল হইতে লাগিল।

বাখর তাহার অদ্ভুত গাঁইটির প্রতি বার বার চাহিয়া কহিল, বড় মসজিদ ফেলে এলাম। এই বার কারেও শুধোন—

আর দূর নাই। কোথাও দেখা হইবে। কিন্তু কি পরিচয় লইয়া সে সেখানে দাঁড়াইবে ? এক বাজারে ত' এমন কতলোক পাশাপাশি বসিয়া বেচাকেনা করে। যতনই বা কি পরিচয়ে তাহাকে আহ্বান করিবে ?

রতন স্থির করিল ফিরিয়া যাইবে।

তখনই মনে হইল—তা'র স্বামী পীড়িত, হয় ত সাহায্য করিবার একটি লোকও তার নাই। তার উপর অর্থের অভাব ত আছেই।

দূর হইতে একটা অস্পষ্ট আর্তরব—তরুপত্রের মর্মরে ভাসিয়া আসিয়া রতনের কানে বিঁধিতে লাগিল। রতন দ্রুতপদে চলিতে শুরু করিল।

বাখর বিরক্ত হইয়া কহিল, হেঁটেই ত' চলেছ দেখি ! কোথায় কার বাড়ী যাবে শুধোও—

সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বে এক বৃদ্ধা চট বিছাইয়া দুটি ছেলে

ও দুটি ছাগল লইয়া গাছের ছায়ায় বসিয়াছিল। রতন জিজ্ঞাসা করিল, যতন বলে কোনো মেয়েমানুষ এখান থেকে শহরের হাটে যায় ?

—কে ? হরি কামারের বউ ?— বুড়ী একটা ছেলের মাথা হইতে উকুন বাছিতে ব্যস্ত ছিল, মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল।

রতন মেয়েটির স্বামীর নাম জানিত না। বর্ণনা করিয়া বলিল, হাতে লাল কাঁচের দুগাচি মোটা রুলী, ঠোঁটের পাশে একটা তিল...সোয়ামীর বড় অসুখ, পয়সা-কড়ির জন্য হাটে যেত।

অসুখের কথা শুনিয়া বুড়ী বুঝিল। বলিল, উই হরি কামারের বউ, আর বল'তে হবে না। বুড়ী পথ বলিয়া দিল।

তালতলার পুকুরের পাশে একটা ভাঙ্গা শিবমন্দির, তারই গায়ের রাস্তায় সজিনা গাছের তলায় হরি কামারের ঘর। সামনের চালায় একটা ঢেঁকী আছে, চিনিবার কষ্ট হইবে না।

বুড়ীর নির্দ্দেশে হরি কামারের কুঁড়ে নিকটেই মিলিবার কথা। আধ মাইল হাঁটিয়া একটা পোড়া কুটীরের সম্মুখে আসিতেই মরণ-যন্ত্রণায় রতনের অন্তরতল কাঁপিয়া উঠিল।

উপরে চালটা পুড়িয়া উড়িয়া গেছে। ছাউনি-শূন্য পোড়া মাটীর দেওয়াল শিরহীন কবন্ধের মত বিকট গহ্বর ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঢেঁকিশালে একটা পোড়া ঢেঁকিও পূর্ব্বের আকার অবিকৃত রাখিয়া পড়িয়া আছে।

রতন ও বাথর সেই দগ্ধ কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরের মধ্যে একধারে হাঁড়ী-কুড়ি থাক্ দিয়া সাজান ; আগুনের তাপে প্রায় সব কটাই ফাটিয়া গিয়াছে। ছোট পোড়া তক্তপোষটার দিক হইতে একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছিল। উভয়ে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটা মানুষ পুড়িয়া মরিয়া আছে।

বাথর ভীতস্বরে বলিল, আর এখানে নয় ঠাকুর! দেখতে পায় ত আমাদেরই ফ্যাসাদে ফেলবে, গাঁ এমন মজার জিনিষ!

বাঁ-দিকের গো-শালে পাগুলি প্রসারিত করিয়া একটা গরুও পুড়িয়া মরিয়া আছে। বর্ণনার সঙ্গে বাড়ীটার কোনো পার্থক্য নাই। সজিনা গাছটিও নিঃশব্দ মৌন দুঃখে বেড়ার বাইরে দাঁড়াইয়া আছে। কেবল...

অপরাহ্ণের ক্লান্ত সূর্য্য তখন বড় বড় গাছগুলার মাথায় রক্তরাগ আঁকিয়া দিতেছিল।

বাথর বলিল, দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে ঠাকুর! অত্যাচারের দণ্ড দিতে ত' পারবে না, চল তোমায় ঘরে দিয়ে আসি—

তুই বাড়ী যা, আমার জন্যে ভাবনা নেই।

এই মেঠো পথ চিনে যেতে পারবে ?

খুব, খুব— বলিয়া রতন মাতালের মত চলিতে শুরু করিল।

অগ্নিদগ্ধ কুটীরের মধ্যে একটা গরু, একটা মানুষ পুড়িয়া মরিয়াছে...আর একজন তার স্বামী ছাড়িয়া গেছে...একা তারই অপরাধে!

পথে সেই বুড়ী তখনও সেই ভাবে বসিয়াছিল। রতন জিজ্ঞাসা করিল, ওদের ঘর পুড়ল কি করে ?

বুড়ি কহিল, বড় ঘরের কথা ছেলে, কি বলব তোমায়!... ছুঁড়ির কপালে এতও ছিল! হাটে গিয়েই ত' কাল করলে। জমীদারের কানে কথা উঠ্‌ল—তারপর ত এই! রাত্তির তখন দুটো—পাইক পেয়াদায় গাঁ ছেয়ে দিলে, তারপর শেষ রাতে...

*

* *

হাটের ভিতর ঝাঁপ ফেলা দোকানটা আর খোলে না। বাঁশ বাখারীর উপর রাশি রাশি ধূলা জড় হইল

অশত্থতলায় বুড়ী একা!

কথা কহিবার লোক নাই।

হরি কামারের পোড়া কুঁড়ের ধারে একটা ছোট কুঠরী উঠিয়াছে।

তার মধ্যে এক বৈরাগীর বাস।

মুখের প্রায় সবটা ঘন কালো চুলে ঢাকা—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া এক জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অহরহ মানুষকে বিঁধিতে থাকে।

কি জাত কেউ জানে না। বাঘর তার বন্ধু। এক বুড়ী তার আহার জোগায়। কালো আলখাল্লার উপর মোটা মোটা নীল কাঁচের মালা গলায় দিয়া দিবারাত্র বসিয়া থাকে।

কে এক প্রিয়জন তার চলিয়া গেছে!

তারই পথ চাহিয়া তার দিন কাটে।

বসিয়া বসিয়া গান গায়—

তুই নিঠুর গরজী!

মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে!

কি আগুনে তার মানস-মুকুল দগ্ধ হয় তা একা সে-ই জানে।

সামনের শূন্য জায়গাটার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তার বুক শূন্য হইয়া পড়ে, পেশীবহুল কঠিন হাত দুটো মুঠি বাঁধিয়া যায়। মাটীর গায়ে মুষ্টির আঘাত করে, আর সেই সঙ্গে গান ধরে—

শাসন তোমার নাশন প্রভু

বাঁধন ছিঁড়ে দাও!

সে গান শুনিয়া ছেলের দল হাসে! বুড়ার দল ভয় পায়, মেয়েরা কাঁদে—

কেহ পায় হাত দিলে লোকটা বলে, আমি পারলুম না, তোরা পারিস! মানুষকে হীন হ'তে দিস্ না। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিস্, অত্যাচারকে শাস্তি দিস, ভালবাসাকে ভয় করিস না, তাতেই মানুষের নব জন্ম হ'বে।...

সিন্ধু

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

বুকে তব সুর-পরী বিরহ-বিধুর
গেয়ে যায়, হে জলধি, মায়ার মুকুর।
কোন্ দূর আকাশের ময়ূর-নীলিমা
তোমারে উতলা করে। বালুচর সীমা
উল্লঙ্ঘি তুলিছ তাই শিরোপা তোমার,—
উচ্ছৃঙ্খল অট্টহাসি,—তরঙ্গের বাঁকা তলোয়ার!
গলে মৃগতৃষ্ণাবিষ, মারীর আগল
তোমার সুরার স্পর্শে আশেক-পাগল!

উদ্যত ঊর্ম্মির বুকে অরূপের ছবি
নিত্যকাল বহিছ হে মরমিয়া কবি!
হে দুন্দুভি দুর্জ্জয়ের, দুরন্ত, অগাধ!
পেয়েছি শক্তির তৃপ্তি বিজয়ের স্বাদ
তোমার উলঙ্গনীল তরঙ্গের গানে।
কালে কালে দেশে দেশে মানুষ-সন্তানে
তুমি শিখায়েছ বন্ধু দুর্ম্মদ-দুরাশা।
আমাদের বুকে তুমি জাগালে পিপাসা
দুশ্চর তটের লাগি'—সুদূরের তরে।
রহস্যের মায়াসৌধ বক্ষের উপরে
ধরেছ দুস্তরকাল;—তুচ্ছ অভিলাষ,
দুদিনের আশা, শান্তি, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস
পলকের দৈন্য-জ্বালা-জয়-পরাজয়,
ত্রাস-ব্যথা-হাসি-অশ্রু-তপস্যা-সঞ্চয়,—
পিণাকশিখায় তব হোল ছারখার!
ইচ্ছার বাড়বকুণ্ডে, উগ্র পিপাসার
ধু ধু ধু ধু বেদীতটে আপনারে দিতেছ আহুতি।
মোর ক্ষুধা-দেবতারে তুমি কর স্তুতি!
নিত্য নব বাসনার হলাহলে রাঙি'
'পারীয়া'র প্রাণ লয়ে আছি মোরা জাগি'
বসুধার বাষ্পাকূপে, উষ্ণের অঙ্গনে!
নিমেষের খেদ-হর্ষ-বিষাদের সনে
বীভৎস খঞ্জের মত করি মাতামাতি।
চুরমার হয়ে যায় বেলোয়ারি বাতি!
ক্ষুরধার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি দিয়া চিতা
গড়ি তবু বারবার,—বারবার ধুতুরার তিতা
নিঃস্ব নীল ওষ্ঠ তুলি নিতেছি চুমিয়া।
মোর বক্ষকপোতের কপোতিনী পিয়া
কোথা কবে উড়ে গেছে,—পড়ে আছে আহা
নষ্ট নীড়,—ঝরাপাতা,—পুবালির হাহা!

কাঁদে বুকে মরা নদী,—শীতের কুয়াশা !
ওহে সিন্ধু, আসিয়াছি আমি সর্ব্বনাশা
ভুখারী ভিখারী একা, আসন্ন-বিবশ !
—চাহি না পলার মালা, শুক্তির কলস,
মুক্তা তোরণের তট মীনকুমারীর,
চাহি না নিতল নীড় বারুণী রাণীর !
মোর ক্ষুধা উগ্র আরো,—বিধাতা আমার
তুলেছিল কুকুরের মত হাহাকার
মোর বুকে ফোঁটা ফোঁটা রুধিরের লাগি' !
পাষণ্ডের মুখখানা উঠেছিল রাঙি'
ক্লেদবসাপিণ্ড চুমি রিক্ত বাসনার !
তারে ঘিরে কেঁদেছিল কুহেলি-আঁধার,—
শ্মশানফেরুর পাল,—শিশিরের নিশা,
আলেয়ার ভিজা মাঠে ভুলেছিল দিশা !
আমার হৃদয়পীঠে মোর ভগবান
বেদনার পিরামিড্ পাহাড় প্রমাণ
গেঁথে গেছে গরলের পাত্র চুমুকিয়া ;
রুদ্রতরবার তব উঠুক নাচিয়া
উচ্ছিষ্টের কলেজায়, অশিব-স্বপনে,
হে জলধি, শব্দভেদী উগ্র আস্ফালনে !
—পূজাথালা হাতে লয়ে আসিয়াছে কত পান্থ, কত পথবালা
সহর্ষে সমুদ্রতীরে ; বুকে যার বিষমাখা শায়কের জ্বালা
সে শুধু এসেছে বন্ধু চুপে চুপে একা।
অন্ধকারে একবার দুজনার দেখা !
বায়ুধূম্র বেলাতটে সমুদ্রের স্বর,—
অনন্ত, অভঙ্গ, উষ্ণ, আনন্দসুন্দর !
তারপর, দূরপথে অভিযান বাহি'
চলে যাব জীবনের জয়গান গাহি' ।

অলকা

শ্রীভূপতি চৌধুরী

অভিধানে অনেক অর্থই লেখা ছিল কিন্তু কোনোটাই আমার মনকে খুশী করতে পারেনি।

পাণ্ডিত্যের আর প্রাণের পুঁথির পাতার লেখা ঠিক এক রকম নয়।

অকারণে মনটা ভার হয়ে ওঠে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম।

হঠাৎ মুখের ওপর কি যেন একটা বাতাসে উড়ে এসে পড়ল। মুঠো দিয়ে ধরে দেখি, চিরুনীর জটছাড়ানো চুলের গুটি। একবার চার পাশে তাকিয়ে দেখি—অলকা ছুটে পালাচ্ছে।

চুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

এমন সময় কে যেন ডাকলে—হরেন!

দেখি বন্ধু, বেড়াতে যাবার সাথী। বাড়ী থেকে বার হয়ে পড়লাম।

পথ আর ঘর এরই মধ্যে গতির দোলক যাওয়া-আসা করে। পথের পালা শেষ করে ঘরে এসেছি পড়ব বলে। পড়ায় মন বসছে না। বইটাই খোলা আছে। অক্ষর-গুলি ট্রামের লাইনের পাথরের মতো সার বন্দী দাঁড়িয়ে আছে। চলার গতির স্পন্দন কি এদের বুকে বাজে না?

এই কথা ভাবছিলাম। চমকে দেখি চুলের হালকা গুটিটি হাওয়ায় উড়ে আমার পড়ার বইয়ের উপর গড়ান সুরু করে দিল। আবার মুঠো দিয়ে সেটাকে বিরক্তি ভরে ধরতে গিয়ে আমার মনে হল, ভারি চমৎকার নরম চুল ত। হাতের মুঠোর মধ্যে কয়েকবার চেপে ধরলাম। কোনো সাড়া পেলাম না।

কি মনে হল। চুলের তালটা ছেড়ে দিলাম। বাতাসে জল না বালি বেশী, এমনই নদী। ভাঙা চাঁদের আলোয় এই বালুবেলায় মরীচিকার সৃষ্টি।

এরই মধ্যে কাজ।

হু হু ক'রে ঝোড়ো বাতাস উঠে আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন কার বুকের দীর্ঘশ্বাস কানের পাশ দিয়া ছুটে গেল।

কাল বোশেখী!

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখি মেঘে মেঘে আকাশ কালো হ'য়ে গিয়েছে। খালি একটা জাগায় একটা মেঘ যেন ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে আর সেই ফাঁকে চাঁদের আলো এক অদ্ভুত ভাবে ফাঁসির আসামীর মতো ঝুলে পড়ে মরে ম্লান হয়ে নিভে গেল।

মনে হ'ল এর সঙ্গে জীবনের কী মিল? ঐ মেঘ আর তারি এককোণে এই মরা আলো। মনে পড়ল—কোথায় যেন পড়েছি এই কালোটাকেই প্রকট করার জন্যে এই আলোর সৃষ্টি। এই কালো অন্ধকারই সত্যি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—আলো কি সত্যই মরা?

জীবনে কিন্তু হয় ত মিথ্যা এই আলোর দীপশিখাটিকেই জ্বালিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। নিভে যায় চলার বেগেই কিনা কে জানে। তখন একবার থামি। সবটা ভেবে নিই—সারা পথ, সেই যেখানে সুরু করেছিলাম।—

কতদিনের কথা? যত দিনেরই হোক্ না কেন, জীবনের জটিলতার জালের মাঝেও সেই পুরাতন পথের আভাস প্রদীপ্ত না থাকলেও প্রলুপ্ত হয়ে যায় না।

তাই ঘটনাটা মনে না থাকলেও তার সূত্রটি ঠিক মনে আছে। আত্মীয় কথাটার অর্থ খুঁজতে সেদিন অভিধান খুলে বসেছিলাম।

সেই গুচ্ছটির খেলা দেখতে লাগলাম। ঘুরে ঘুরে দোলার মত কতবার পুরানো পথে আনাগোনা ক'রে একটা দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল। বইয়ের পাতাগুলো যেন বেদনায় আর্ত্তনাদ করে উঠল।

বইয়ের মলাটটা উল্টে দিয়ে, টেবিল ছেড়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম।—

মাসীমা অলকাকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

অলকা শুধু মৃদু হেসে বলে গেল, জানি না।

—আচ্ছা যাচ্ছি একটু পরে।

ঠক্ করে একটা শব্দ হল। দেখি কাচের জানালার গায়ে একটা পোকার মাথা ঠুকে গেল। বোধ হয় সে মনে করেছিল এই পথ।

মাসী-মা বললেন, একটা বরটব খুঁজে দে। অলকার ত বিয়ের বয়স হল।

—হল নাকি? এ প্রশ্ন কাকে করলাম—মাসী-মাকে, না নিজেকে?

—তোদের ঐ এক রকম। তুই একটু চেষ্টা কর্ বাবা।

আমি স্পষ্ট বলে দিলাম, পারব না। আমি কি ঘটক?

একথা কেন যে বললাম তার কারণ বলতে পারি না। কিন্তু মনে হল বলাটা বোধ হয় অন্যায় হল।

অলকা একটা রেকাবিতে খাবার নিয়ে এল। হেসে বললাম, এ কি ঘুষ নাকি? তাহলে একান্তই চেষ্টা করতে হল দেখছি। অলকারও যখন ইচ্ছে।

মাসী-মা হেসে উঠলেন, পরিহাস মনে করে। অলকা বাঙালী-মেয়ে-সুলভ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। এ ইঙ্গিত এত সোজা।

মাসী-মা বললেন, হরেন, এ কাজ তুই যেমন যত্ন নিয়ে করবি তেমন আর কে করবে বল্?

কোন জবাব দিলাম না। সত্যিই ত আমি ছাড়া আর কে তেমন যত্ন নেবে!

গাছের ফুল, সে কি বিলোবার জন্যে?

পথে কত লোক ঘুরে বেড়ায়, কেউ কাজে কেউ অকাজে।

বাঙালীর মেয়ে এত সস্তা জানতাম না। বিয়ের বয়সের যে সীমা আছে সেটা পার হ'য়ে গেলে নাকি পাত্রাপাত্রের বিচার থাকে না। ভাল।

আমার দিক থেকে কোন চেষ্টা হয়নি। না হোক, তবুও অলকার বিয়ে হচ্ছে। খবর পেলাম বিছানায় শুয়ে। ভোরের বাতাসে সানাইয়ের সুর আমার তন্দ্রা ভাঙিয়ে এই কথা বলে গেল।

অতো সকালে মা এসে বললেন, হরেন, আজ অলকার বিয়ে। ওবাড়ীতে গিয়ে খেটেখুটে দিয়ে আসিস। অলকার মা অনেক করে বলে গেছে।

কোন জবাব দিলাম না। মা বলে চললেন, কাল যে ওরা কতবার খোঁজ করেছিল তা বলবার নয় কিন্তু ছেলের ত আর টিকি দেখবার জো নেই।

—আচ্ছা— এই হল আমার কথার উত্তর।

মা বললেন, আর আমি এখনি ওবাড়ী যাচ্ছি। একলা মানুষ, কাঁহাতক সব দিকে চোখ রাখে।

—কিন্তু মা, আজ যে আমি— মা'র সঙ্গে সকাল বেলাতেই মিথ্যা কথাটা আর বললাম না। কথার মুখ ঘুরিয়ে বললাম, বিয়ে সেই রাত্তিরে ত।

—আটটার সময়। তুই তা বলে যেন ঠিক নেমন্তন্ন খেতে যাস্ নি। আজ সকাল থেকেই তোকে ওখানে যাবার কথা বারবার বলে গেছে। তুই চানটান করেই আয়। একদিনেই বিয়ে আর গায়ে হলুদ কি না, বড্ড ঝামেলা!

আচ্ছা, আমি না হয় সকাল সকালই যাব'খন।

মা চলে গেল।

বিছানায় একান্ত নিশ্চল ভাবে পড়ে রইলাম! একটা গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে মোড় ফিরে গেল।

যাক্। তবু যেতে হবে।

মাসী-মা'র কাছ থেকে আবার তাগাদা এল।

ও বাড়ীতে গিয়ে দেখি তুমুল কাণ্ড বেধে গিয়েছে। ধোঁয়া আর কোলাহল বাড়ীর ছাদের মেরাপে আটকা

পড়ে ঘুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তার কোনো নির্দ্দিষ্ট পন্থা নেই।

আলো আনন্দ ও উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে একটি পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল।

সব জায়গার আলো একে একে নিভে গেল, এবারে জ্বালা রইল শুধু একটি ঘরে।

ছাতের সিঁড়ি বাসর ঘরের পাশ দিয়ে নেবে এসেছে। সমস্ত শেষ করে যখন ফিরছি তখন দেখি সমস্ত বর্ণ গন্ধ গান শুধু একটি ঘরে বন্দী হয়ে পড়েছে। আনন্দ-স্রোতে বান্ এসেছে। কৌতূহলীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম—চারপাশে অসংখ্য তরুণী, কত বর্ণের ছটা, তবুও তারই মধ্যে অলকাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। তাকে যেন জয়গর্ব্বিতা রাণীর মতো দেখাচ্ছে!

জয়ের আনন্দস্তম্ভ কি পরাজয়ের বেদনা স্তূপের ওপর গড়ে ওঠে না?

বরটি কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে বসে আছে। মানুষ নেশা করে যেমন বসে থাকে। জীবনে এতবড় নেশার পেয়ালা এর পূর্ব্বে আর কে পান করেছে?

বাইরে বাঁশীর সুর ভারী ধীর মন্থর গতিতে গড়িয়ে চলেছে।

মাসী-মা'র ডাক কানে আসতেই দূরে সরে গেলাম।

মাসী-মা আমার দিকে আসতে আসতে সিঁড়ির ধাপ ভুল করে পিছ্‌লে পড়লেন। তাঁর হাতের গেলাস থেকে তরল খানিকটা কি চল্‌কে পড়ে গেল। মা পিছনেই ছিলেন। তাড়াতাড়ি এসে মাসী-মা'কে ধরলেন। মাসী-মা'র আঘাত লাগেনি। আমায় অনুযোগ করে বললেন—তোর জন্যে খাবার আনছিলাম, দেখ্ দেখি পড়ে গেল।

হেসে বললাম—অন্ধকারে একটু দেখে আসতে হয়।

কথাটার মানে হয় ত কেউই বুঝল না।

যাক্‌গে। কিন্তু আর ভাল লাগছে না। মনে হল বন্ধনের সূত্র যেন আলগা হয়ে গেছে। এই সুযোগ। একেবারে বলে ফেললাম—আজ ত সব চুকে গেল। কাল আর বিশেষ কাজ ত নেই। আমি কাল আসতে পারব না। বিশেষ দরকারে আমায় সকাল বেলাতেই কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে।

সে কি হয়? বরক'নে বিদায়, তুই না থাকলে—

এইবার আমার অবর্ত্তমানে কত হাঙ্গাম হতে পারে মাসী-মা তার সব বর্ণনা করে গেলেন। অবশ্য একটা বাদ দিয়ে। আমার কথাটা কেউ দেখলে না। তাই বললাম—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

বাকী রাতটুকু ঘুম হয় নি। ভাবছিলাম—বিদায় নেওয়া যায় চোখের কাছ থেকে; কিন্তু মনের দিক থেকে?

সকালেই একটা হোল্ড-অলে জিনিষপত্র গোছাচ্ছি, এমন সময় মা এসে বললেন—হরেন, তুই কখন্ বেরুবি?

মা'র মুখে কথা শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। মাও কি আমার এই নির্ব্বাসনই চান! তাই প্রশ্ন করলাম—কেন?

তোর খাবারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ত। কিন্তু এত সকালে না গেলে নয়? খুব দরকারী কাজ?

না, মা দেখছি ভেবেছেন আমি তাঁর কাছে সত্য কথাই বলেছি। আচ্ছা এইই সত্য হয়ে থাক্। সত্য আর মিথ্যার মধ্যে প্রভেদই বা কি?

মা আবার প্রশ্ন করলেন—কখন খাবি বল্?

—যদি বলি আধ ঘণ্টার মধ্যে?

—ও যদি-টদি নয়, ঠিক কখন্ খাবি বল্। ভাত তৈরি চাই ত?

ভাত আমার চাই না। আমি ঘরের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললাম—ঠিক সাতটায় বার হব। সাতটা পনের মিনিটে ট্রেন। এখন সাড়ে ছ'টা।

মা তখনই বোধ হয় আমার খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেলেন।

হোল্ড-অল ভরতি করতেও যেন কেমন অবসাদ আসছিল। তাই মাঝে মাঝে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম।

একটা মাকড়সা ওপর থেকে আমার হাতে পড়ল। বোধ হয় জাল তার ফেঁসে গেল।

ট্রেণের জানালা থেকে মনে হয় দুধারের প্রান্তর

সকলেই যেন দূরে সরে যাচ্ছে। জগৎকে দেখবার এ একটা ভারী সুন্দর ধরণ। কিন্তু এ ভাবে কি বেশীক্ষণ থাকা যায়? তখন মনে হয়, যারা দূরে সরে যাচ্ছে তাদের কাছে দাঁড়াতে পারলেও সুখী হই।

আবার তাই মায়ের স্নেহাঞ্চলে ফিরে এলাম। এবারে হোল্ড-অলের বুক খালি করার পালা। ঘরটা আমি বন্ধ করে গিয়েছিলাম। খুলে দেখি ধূলোয় সব ভর্ত্তি হয়ে গেছে। ঘর সাজাতে চোখ পড়ল এক কোণে একটি চুলের খুঁটি লূতা-তন্তুতে আটকে পড়ে আছে।

আচ্ছা থাক।

একটা ভাড়াটে গাড়ীর মাথায় তোরঙ্গ বিছানার বোঝা চাপিয়ে কারা যেন মাসী-মা'র বাড়ীতে এল।

মা দেখি একটু পরে ওবাড়ীতে চলে গেলেন।

ফিরে আসার পর আজ এই প্রথম ওবাড়ীর দিকে তাকালাম। কেন তাকাইনি?—বোধ হয় অবসর ছিল না।

যে দিন পাকা একটি বছর বাদে ফিরলাম সে দিন মাসি-মা এসে দেখা করে দেশ-বিদেশের গল্প শোনাবার নিমন্ত্রণ করে গেছলেন। কিন্তু যাই নি—সময় কোথা, আর কেনই বা?

মা রাত্রে খাবার সময় বললেন—ওরে অলকা এসেছে। সে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।

কোন জবাব না দিয়ে খেয়ে চললাম। মা বললেন,—অলকার মা দুঃখু করছিল যে, তুই আর দেখাটেখা করতে যাস্ না।

আমার হাসি এল। বললাম—তুমি ত জান মা, আমার কত কাজ। কখন যাই বল ত। আর ঠিক দুপুর বেলা লোকে যখন একটু গড়িয়ে নিতে পারলে বাঁচে সে সময় ত আর গিয়ে উৎপাত করা যায় না।

—সে আমি বলেছি। অলকা বললে, তোর যাওয়ার সুবিধে না হয় সে-ই আসবে এখানে।

ওঃ।

কিছুই ঠিক করতে পারলাম না,—খাওয়ার পরই পালাব, না প্রতিদিনকার মতো বিশ্রাম করব।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে যখন ঘরে ঢুকছি তখন ঘড়ির একটা আওয়াজ আমার মাথায় ঘা মেরে কাল রাত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি আলনা থেকে কোট-টুপিমোজা নামিয়ে টেবিলে রাখলাম। কিন্তু তখনি আবার মনে হল—না তাই বা কেন?

প্রায় একরকম জোর করে নিজেকে ঘরে বসিয়ে রাখলাম। প্রতি শব্দে আমি তাদের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দু'টো বেজে গেল। তখনও তারা এল না দেখে আর নিজেকে বন্দী করে রাখতে পারলাম না। কাজে বার হ'য়ে পড়লাম।

রাত দশটা। তখন আবার বাড়ীর দরজার কাছে। মা আমার না-আসা পর্য্যন্ত জেগে থাকতেন। আমায় জিজ্ঞেস করলেন—এত রাত হল যে?

কোটটা খুলতে খুলতে জবাব দিলাম—বড্ড কাজ পড়েছে।

ভাবলাম জিজ্ঞেস করি—ওরা আসেনি? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করতে হল না, মা আপনিই বললেন—আমিও তাই বললুম। অলকারা আড়াইটার সময় এসে দেখে তুই বার হয়ে গেছিস্। রাগ করে বললে—ভারি কাজ! একদিন কি আর দেরী করে যাওয়া চলে না! আমি ত কাল তোমায় বলেছিলাম মাসী-মা। তা আমার বাবু কোন দোষ নেই। আমি কাল তোকে বলেছিলুম।

আমি হেসে বললাম—ব্যবস্থা ঐ পর্য্যন্ত ঠিকই ছিল এ কথা আমি স্বীকার করছি।

এর পর দুপুর বেলা বিশ্রাম লওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। এটা যে দুর্ব্বলতা তা মনে মনে বুঝি। কিন্তু যে জিনিষ বোঝা যায় তা অনেক সময় করা যায় না।

মা একদিন হাসতে হাসতে বললেন—আজ অলকার একটি খোকা হ'য়েছে।

কোন ভাব প্রকাশ না করে নীরস স্বরে বললাম—ভাল। আনন্দের কথা। মাসী-মা'কে সন্দেশ খাওয়াতে বল।

মাসী-মা সত্যিই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলেন।

আবার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া গেল। মনে হয় আগেকার সেই স্থিরতা যদি ফিরে পাওয়া যায়।

অলকার হাতের বোনা পশমের ছবিটার রঙ ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানা যেখানে টাঙান ছিল সেইখানেই টাঙান আছে।

রাস্তা দিয়ে বাসন-ওয়ালা কাঁসি বাজিয়ে চলে যায়। তার মধ্যে কোনো সুর নেই। না থাক্, কিন্তু বাসন নিশ্চয়ই বিক্রী হয়, নয় ত সে চলে কেন?

হঠাৎ এ দুপুরে ছেলে কোলে নিয়ে অলকা আমার ঘরে উপস্থিত। আমি অবাক।

অলকা ঘরটার চারদিক চেয়ে বললে—ও ছবিটা আজও রয়েছে দেখছি, কিন্তু রং উঠে গেছে।

কোন উত্তর দিলাম না। ছবির রঙ উঠে যেতে পারে জানি।

মা বললেন—দেখ্ কি সুন্দর ছেলে!

মা'র কথায় ছেলেটির দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। ভাল বা ঐ রকম একটা কিছু বলা বোধ হয় উচিত ছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

আমি দেখছিলাম অলকাকে। মা হ'য়ে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু মনে হল এ ছেলে তার কোলে যেন মানায় নি।

ভদ্রতার খাতিরে ছেলেটিকে একটু আদরও করলাম। কিন্তু ভালো লাগছিল না। এ সঙ্কট থেকে ঘড়িটা আমায় উদ্ধার করলে এলার্ম বাজিয়ে। আমি পোষাক পরা সুরু করে দিলাম।

অলকা এতক্ষণ ঘরের চার পাশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখছিল। এখন আমায় যাবার উদ্যোগ করতে দেখে বললে—এত কাজ?

চেয়ারটার ওপর পা তুলে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললাম—তা' বৈ কি।

অলকা কোন জবাব দিলে না। হঠাৎ সে তার ছেলেটিকে আদর করা সুরু করে দিলে।

বললাম—আর একদিন নয় সকাল সকাল এস, গল্প করা যাবে।

—আমায় ভারী দায় পড়েছে। পরশু চলে যাব।

ছেলেকে আদর করার মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

কি করা যায়। অকারণে চেয়ারটা টেনে একটা শব্দ করে বললাম—এত শীগ্‌গির?

—এসেছি ত বড় কম দিন নয়। আর তা ছাড়া এখানটা আর ভালোও লাগছে না।

কথাটা নতুন। আর এতে রহস্য করার সুযোগও ছিল। কিন্তু এ সুযোগ গ্রহণ করার প্রবৃত্তি বড় ছিল না। শুধু বললাম—আচ্ছা আমিই না হয় ওবাড়ী যাব 'খন।

—দয়া— বলে অলকা তার খোকাকে বুকে তুলে নিল। তারপর আমি ঘর থেকে বার হ'য়ে যাবার আগে সে-ই নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

তীর যখন বেঁধে তখন আগে থেকে না জানিয়েই বিঁধে যায়।

নিজের ওপর রাগ হল। হয় ত সেই জন্যে চট্ ক'রে মাথাটা ধরে উঠল। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম—ভয়ানক রোদ। আজ সত্যই কোন কাজ ছিল না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে' পোষাক ছেড়ে বিছানার আশ্রয় নিলাম।

বাইরের সঙ্গে আর কোনও সম্বন্ধ রইল না। ঘরের মধ্যে পাখাটা ঘুরে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে আমার চিন্তার ধারাও। একটি কথাকে কেন্দ্র করেই সে ঘুরে যাচ্ছিল।

নদী না বালির পরিহাস। তারি ওপর সেতুর সান্ত্বনা গড়ে তুলতে হবে। এ কাজের ভার কি না আমারই ওপর।

সেতুর স্তম্ভ বালুর ওপর গড়ে তোলা যায় না। তার ভার সহন করার জন্যে চাই পাথরের স্তর। বালিই জমাট বেঁধে পাথর হয় জানি, কিন্তু পাথরের গ্রন্থি শিথিল হলে কাজ চলে না। তাই সেই বালির স্তরে পাথরের স্তরের সন্ধান চলতে লাগল।

কাজ আর কাজ—দিন আর রাত্রি কর্ম্মের রথ দুই পথেই সমান যেতে পারে। আমাকেও যেতে হয়।

এই ত চলা।

মায়ের চিঠি পেলুম।

অলকা মারা গেছে তার ছেলেটিকে রেখে। ছেলে তার খোঁজ করে, পায় না। সে ব্যাপারটা বোঝেনি। অত

ছোট ছেলে তবুও সে কত ভাবে তার মায়ের কথা জানবার চেষ্টা করে।

মা'রও দেখলাম খুব মনে লেগেছে। সমস্ত চিঠিটাই অলকার কথাতে ভরা। তাকে নাকি মা'র বড় ভাল লাগত।

মা অনেক খুঁটিনাটির কথা লিখেছেন। সে তার স্বামীর সঙ্গে পশ্চিমের কোন্ এক শহরে গিয়ে সবে সংসার পেতেছিল। কিন্তু জীবন ভালো করে উপভোগ করার আগেই তার সব আশার শেষ হয়ে গেল।

বাইরে কালবোশেখীর ঝড় উঠল। পাখীর দলে চীৎকার উঠল। হয় ত তাদের কেউ আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়ল।

মা লিখেছেন—তার নাকি যাবার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না। তার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সেই অজ্ঞান অবস্থার মধ্যেই সে যেন হাত বাড়িয়ে কাকে ধরবার চেষ্টা করছিল।—

এ ধরবার চেষ্টা কাকে?

মায়ের চিঠিটা আমার চোখের সামনেই মেলা রইল বটে কিন্তু চোখে আমার আর দৃষ্টি ছিল না।

সেই অন্ধকারে আমার সহকারী এসে বলে গেল—পাথরের স্তর পাওয়া গেছে।

—আচ্ছা।

লেখা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি? হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হোক্ লয়
সমাপ্তির রেখা-দুর্গ। নব লেখা আসি দর্প ভরে
তার ভগ্ন স্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক্ জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগ-বিজয়ার দিনে পূজার্চ্চনা সাঙ্গ হ'লে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধূলা তারে ডাক দিয়া কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবিরে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা॥"

—'লেখা'

বুলবুলি

গজল গান

কথা ও সুর—নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

সা | সা ঋা সণ্‌া সা | া মা -া মা | মা -া মা জ্ঞা | া পা -া মা |
বা গি - চা য় - বু ল্ বু লি - তু ই - ফু ল্ শা
আ জো - তা ব্ - ফু ল্ ক লি - দে র - ঘু ম্ টু
আ সে - নি - - দ খ্ নে হা ও য়া - - গ জ ল্
শি শি - রে র - স্প - র্শ সু - খে - - ভা ঙ্ বে
কুঁ ড়ি - দে র - ও - ষ্ঠ পু - টে - - লু ট্ বে
ফু লে - ভো র্ - বু ক্ ভ' রে - ছি স - আ জ্ কে

II II II

জ্ঞা রা জ্ঞা রা | জ্ঞা সা -া ঋা | জ্ঞা রা জ্ঞা ঋা | সা -া া
খা - তে - - দি স্ নে আ - - জি দো ল্ -
টে - নি - - ত ন্ দ্রা তে - - বি লো ল্ -
গা ও য়া - - মৌ - মা ছি - - বি ভো ল্ -
য়ে - ঘু ম্ - রা ঙ্ বে রে - - ক পো ল্ -
হা - সি - - ফু ট্ বে গা - - লে টো ল্ -
জ - লে - - ভ র বে আঁ - - খির কো ল্ -

পা | পা া- পা মা | -া দা -া দা | দা -া দা পা | া পা ণা দা |
আ জো - হা - য় রি - ক্ত শা - খা য় - উ - ত্ত
ক বে - সে - - ফু ল্ কু মা - রী - - ঘো ম্ টা
ফা গু - নে - য় মু কু ল্ জা - গা - - দু - কূল্
ক বে - তু ই - গ ন্ ধে ভু - লে - - ডু ব্ লি

পা মা গা সা | ঋা গা -া মা | পা দা মপা -া | মা গা সা ঋা | গা মা পা মা |
রী - বা - য় ঝু র্ ছে নি - শি - দি - - ন রে - - -
চি - রি - - আ স্ বে বা - হি - রে - - - - - - -
ভা - ঙা - - আ স্ বে ফু - লে ল্ বা - - ন্ রে - - -
জ - লে - - ফু ল্ পে লি - নে - আ - - র রে - - -

পুরাতনী

মীমাংসা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রথম বর্ষের "সাধনা" হইতে উদ্ধৃত]

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনও আমাদের বাড়ির ছাদেও উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড় ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনও চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যাবেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রের সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি। এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছেন, "বারণ করলো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।"

বুঝিতে পারি চণ্ডিদাস কেন লিখিয়াছেন,

"যে না দেশে বাঁশির স্বর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?—

পাঠকের উত্তর

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধূ নই। কারণ, আমি পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোক্‌রা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যূষ হইতে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত সারিগম্ সাধিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সড়্‌গড় হইয়াছে, এখন প্রত্যেক সুরে কেবলমাত্র আধসুর শিকিসুর তফাৎ দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে—ঘরে আর কিছুতে মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন, "বারণ করলো, সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।" শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম্ সাধিতে ছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডিদাস কেন লিখিয়া ছিলেন—

"যে না দেশে বাঁশির স্বর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

বোধ হয় চণ্ডিদাসের বাসার পাশে কন্সর্টের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোকরা বাঁশি অভ্যাস করে, বোধ হয় তাহার নাম মুকুন্দ ঘোষ।

শ্রীসঙ্গীতপ্রিয়

আমার এ কি হইল! এ কি বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া "চমকি চমকি উঠি"।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।

শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী, সখীকে ডাকিয়া বলি, 'উহু উহু, সখি, দ্বার রোধ করিয়া দাও।"

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব।

মনোহরা শারদ পূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী—কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে!

আমার ন্যায় আর কোন হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন,

"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং॥"

অন্যত্র লিখিয়াছেন, "নিশি নিশি রুজমুপযাতি।" আমারও সেই দশা। রাত্রেই বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কি হইল ?

পাঠকের উত্তর

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বাররোধ করিয়া দাও সেটা ভালই কর। পরীক্ষা স্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ঐ এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ, বাত, পয়ার এবং জোয়ার ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভাল ডাক্তার ছিল না, তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

নূতন উত্তীর্ণ ডাক্তার

সমালোচক

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সৃষ্টির ক্ষমতা যাঁর আছে তিনি সৃষ্টি করেন, যাঁর রসবোধের শক্তি আছে তিনি আস্বাদন করেন; এর মধ্যে সমালোচক লোকটি আবার কে? ইনি ঠিক লেখকও নন, আবার শুধু পাঠকও নন, অথচ একাধারে পাঠক ও লেখক। আর সেই দ্বৈত ভাবের জোরে পাঠককেও চোখ রাঙান, লেখককেও শাসন করেন। এই গুরুগিরির ফলে এঁর ধারণা জন্মে, আর সরল লোকেরও বিশ্বাস হয় যে, ইনি পাঠকদের চেয়ে অনেক উঁচু, আর লেখকদের চেয়েও খাটো নন। এ মিথ্যা জ্ঞাননিরাশের এক উপায় 'সমালোচক' সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।

সমালোচনার মূল তত্ত্ব বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও রসের অনুভূতি কারও সূক্ষ্ম, কারও মোটা, কারও ব্যাপক, কারও সঙ্কীর্ণ। বেশীর ভাগ পাঠকেরই সাহিত্যের বোধ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক নয়। কিন্তু অনেক পাঠকের এটুকু শক্তি আছে যে, দেখিয়ে দিলে তারা দেখতে পায়। সমালোচনার কাজ এই দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যাঁর অনুভূতিতে সাধারণ দৃষ্টির অতীত সুষমা ও রসের উপলব্ধি হয়, তাঁর যদি অপরকে তা দেখিয়ে দেবার শক্তি ও প্রেরণা থাকে তবে তিনিই সমালোচক। সাহিত্যের জগতে সমালোচক হচ্ছেন দ্রষ্টা ও দর্শয়িতা।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথম শ্লোকটি সকলেরই জানা আছে।

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
> হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
> স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

আমরা সাধারণ পাঠকেরা কাব্যের এই প্রথম শ্লোকের কাছে বেশী আশা করি না। কারণ এর কাজ কাব্যের

বিষয়ের অবতারণা মাত্র। তবুও এই হিমালয় বর্ণনার বিষয়োচিত গাম্ভীর্য্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, এবং আমাদের কান ও মন দুই-ই যে এতে বেশী খুশী হয়ে ওঠে তাও বুঝতে পারি। এই 'খুশী' হওয়ার তত্ত্বটা আলঙ্কারিকদের চোখে ধরা পড়েছে। অনেকগুলি পদ নিয়ে এ শ্লোক, কিন্তু এর এক পদের সঙ্গে অন্য পদ, তাজমহলের পাথরের মত এমনি চমৎকার মিশে গেছে যে, মাঝের জোড়া আর দেখা যায় না, মনে হয় এর সব পদ নিয়ে সমস্ত শ্লোকটা যেন একটি মাত্র পদ। আমাদের কান যে এ শ্লোকে খুশী হয় তার প্রধান কারণ এর "মসৃণত্ব"। আলঙ্কারিকেরা আরও ধরিয়ে দিয়েছেন যে, এ শ্লোকের সমস্তগুলি পদ, শব্দে ও ভাবে, ঠিক এক পথে চলেছে—হিমালয়ের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যকে ফুটিয়ে তোলার দিকে; সে "সমতা" কোথায়ও ভঙ্গ হয় নি। এবং এতেই মনকে খুশী করে' তোলে। আলঙ্কারিকেরা নিজেদের সমালোচক বলতেন না। কিন্তু কালিদাসের এই শ্লোকের 'মসৃণত্ব' ও 'সমতার' দিকে পাঠকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ তা হচ্ছে যথার্থ সমালোচকের কাজ। দেখিয়ে না দিলে অনেক পাঠককেই তা এড়িয়ে যায়, এবং একবার চোখে পড়লেই রসানুভূতি পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে।

এর পাশাপাশি এমনি 'সমালোচনার' একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত তোলা যাক্।

"পয়ার আট পায়ে চলে বলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদ বধ কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট-বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীর মর্য্যাদা সুগম্ভীর হ'য়ে বাজ্‌ল—'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু'—তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মত ভাঙা ছন্দে ভেঙ্গে পড়ল—'চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে'—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার কর'ল, 'কহ হে দেবী অমৃত-ভাষিণি,' তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্বোষিত হ'ল—'কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি।'

—রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৪

আলঙ্কারিকদের উপর সুবিচার করতে হ'লে রবীন্দ্রনাথের 'সমালোচনা'য় যে টুকু মহাকবির প্রকাশভঙ্গী তাকে বাদ দিয়ে তুলনা করতে হবে। এবং তা করলে বোঝা যাবে যে, প্রাচীন ও নূতন—এই দুই 'সমালোচনা' এক জাতীয়। উভয়েই কাব্য-কৌশল সূক্ষ্ম অনুভূতি ও তার প্রকাশ।

কিন্তু এমন 'সমালোচনা' ইচ্ছা থাক্‌লেই লেখা যায় না, যেমন ইচ্ছা করলেই কবি হওয়া যায় না। কিন্তু অকবি লোকেও কাব্য লেখে, আর যার কোনও রকম সাহিত্যিক সূক্ষ্মদৃষ্টি নেই সেও সমালোচক হয়। স্বভাবতই তাদের সমালোচনায় আলো থাকে না, থাকে শুধু উত্তাপ। কোনও নূতন সৌন্দর্য্য, কি রস, তারা পাঠকদের দেখাতে পারে না, কারণ তা তাদের নিজের চোখেই পড়ে না; সুতরাং তারা সোজসুজি সাহিত্যের বিচারক হ'য়ে বসে' ডিক্রি-ডিস্‌মিস্-এর রায় দিতে থাকে। এবং ডিক্রির চেয়ে যে তাদের ডিসমিসের রায় হয় অনেক বেশী তার কারণ এতে সহজেই প্রমাণ হয় যে, তাদের সাহিত্যিক আদর্শটা ভারি উঁচু, এত উঁচু যে বেশীর ভাগ সাহিত্যই তার সিকিও নাগাল পায় না। 'কিছু-হচ্ছে-না' বল্লেই ইঙ্গিতে জানানো হয় যে 'হওয়া-যাকে বলে' তার ধারণাটা আমার কত বড় তা তোমরা সাধারণ লোকেরা ধারণাই করতে পারবে না।

সাহিত্যের এই হাকিম-সমালোচকেরা সচরাচর নবীন সাহিত্য ও নূতন লেখকদের সমালোচনা করেন। কালের কষ্টি-পাথরে যে সাহিত্য সোনা বলে' প্রমাণ হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা কঠিন কাজ। তাকে 'কিছু নয়' বলা চলে না, 'খুব ভাল' বল্‌লে কিছু বলা হয় না। অন্য লোকে সে সম্বন্ধে যা বলেছে তার অতিরিক্ত কিছু চোখে পড়লে তবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু সমালোচক নাম নিলেই চোখে দৃষ্টি আসে না, সেটা বিধাতার দান।

নবীন লেখকদের সমালোচনায় এ সব আপদ নেই। সেখানে নির্ভয়ে হাকিমী করা চলে। চোখের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, ঘুষির জোর থাকলেই যথেষ্ট। অথচ নবীন সাহিত্যের সমালোচনায় রসবেত্তা সমালোচকেরাও যুগে যুগে কতই না অদ্ভুত কথা বলেছে। শেক্‌স্‌পীয়রের যশ অচল হ'য়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কতদিন? শেলী যে বায়রণের চেয়ে বড় কবি এ কথা প্রথমে ইংলণ্ডের কোনও সাহিত্য-সমালোচক বলেনি, বলেছিল একজন ন্যায়শাস্ত্র ও অর্থনীতির পণ্ডিত—নাম জন ষ্টুয়ার্ট মিল! কিন্তু সমালোচকদের বিশ্বাস যে, সমসাময়িক নবীন লেখকদের সম্বন্ধে তাদের ভাল-মন্দ লাগাটা বড়-ছোটর একেবারে নিভুর্ল মাপকাঠি!

এই সমালোচকেরা ভাবেন যে, তাঁদের নিন্দাপ্রশংসা সাহিত্যের বড় হিতকর। তাঁদের প্রশংসায় সু-সাহিত্য উৎসাহ পায়, আর অ-সাহিত্য ও কু-সাহিত্য লজ্জায় মুখ ঢেকে সাহিত্য-সমাজ থেকে বিদায় হয়। এর কোনটাই ঘটে না। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা রসগ্রাহী পাঠকের অপেক্ষা রাখলেও সমালোচনার কোনও অপেক্ষা রাখে না। আর সাহিত্যের সংসারে অসাহিত্য টিকে থাকে বি-রসজ্ঞ পাঠকদের কৃপায়। তারা যতদিন আছে, এবং তারা চিরকাল থাকবে, ততদিন সমালোচকের লাঠি তার কিছুই করতে পারবে না। সাহিত্যের জগতে সমালোচক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—কিছুই নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি, কি পালন, কি কি সংহারে তার কোনও হাত নেই। যে সমালোচক মনে করে যে, সাহিত্য সৃষ্টির কাজে তার সহায়তা আছে, তার ভুলটা ঠিক সেই রকমের, যদি জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মনে করত যে, গ্রহের চলা-ফেরার রাস্তা আবিষ্কার করে তার গতির সহায়তা করা হচ্ছে। বিশ্বের রহস্যকারীর মনে যে প্রকাশের আবেগ আনে তা থেকে কাব্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী রসজ্ঞের মনে যে আনন্দের আবেগ আনে সমলোচনা তার অভিব্যক্তি। ইন্‌স্‌পেক্‌টারি করা সমালোচকের কাজ নয়, তা 'স্যানিটেরিই' হোক আর 'লিটেরেরিই' হোক। সাহিত্যের হিতেচ্ছায় যে সব সমালোচনা হয় তা অনেক পরহিতৈষণার মত শুধুই পীড়াদায়ক।

—কালি-কলম

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(৫)

কর্ত্তার মৃত্যুর পর বাড়ীর কিছুই বদল হইল না। গাড়ী-ঘোড়া, মালী, চাকর—সবই বজায় রহিল। কেবল মাত্র বাইরের বৈঠকখানাটি কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিকার করিলেন। তিনিই এখন বাড়ীর কর্ত্তা।

দীপক বড় হইয়াছে, সে এখন স্কুলে যায়, বিকালে মাষ্টার আসিয়া তাহাকে লইয়া পড়াইতে বসেন। দীপকের আর একটি ছোট বোনও সেই সঙ্গে মাষ্টারের কাছে পড়ে; আর কিছুতে না হোক্, মাষ্টার সম্বন্ধে এই দুই জনে খুব ভাব। পড়িতে তাহাদের কাহারও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঐ যে মাষ্টার আসিয়া ঘাড়ের উপর বসিয়া থাকেন এবং তাহাদের মাথা গুজিয়া হাত পা গুটাইয়া পড়িতে হয় এইটাই তাহাদের কাছে যেন কেমন ঠেকে। মাষ্টার যখন থাকে না, তখনও তাহারা ত পড়ে, কিন্তু এমন খারাপ ত লাগে না। বোনটি দাদার কথাই মানিয়া চলে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে ঝুপ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দীপক আশা করিতেছিল, আজ আর মাষ্টার মশাই আসিবেন না। দীপক ঠাকুরদেবতার নাম করিয়া প্রার্থনা করিল, হে ঠাকুর, বৃষ্টি যেন আরও জোরে আসে, সন্ধ্যাটা অন্তত পার হইয়া যায়।

রাস্তা ঘাট মাঠ উঠান জলে থৈ থৈ করিতেছে! আর কি মাষ্টার আসে? কিন্তু একটু পরেই পথের বাঁকে একখানি পরিচিত ছাতা দেখিয়া দীপকের মুখ শুকাইয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি এক দৌড়ে বাড়ীর ভিতরে যাইয়া যেখানে নীলাম্বরের মা ও তাহার মা গল্প করিতেছিলেন সেখানে শুইয়া পড়িল।

নীলাম্বরের মা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দীপু?

দীপক আর একবার গা মোড়ামুড়ি দিয়া চাপা গলায় বলিল, বড় মাথা ধরেছে।

ছোট বোনটি হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

নীলাম্বরের মা ত খোকার অসুখ শুনিয়া একটু অস্থির হইয়াই পড়িল। তাড়াতাড়ি একখানি চাদর আনিয়া খোকার গায়ে বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল। দীপক চাদরের ভিতর মুখ গুজিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল।

ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, মাষ্টার বাবু আসিয়াছেন।

দীপকের মা বলিয়া দিলেন, মাষ্টার বাবুকে বলে দাও, খোকাবাবু আজ পড়তে যাবে না। মাধুকে তিনি পড়িয়ে যান্।

এতক্ষণ ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু বজ্রপাত হয় নাই। মায়ের হুকুম শুনিয়া মাধুরীর মাথায় বাজ পড়িল।

পড়িতে যাইবার সময় একবার দাদার দিকে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া সে অগত্যা চলিয়া গেল।

বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে দেয়ার ডাক, ঠাণ্ডা ঘূর্ণী হাওয়া; মনটা কেমন উতলা করিয়া তোলে! দীপক আর বেশীক্ষণ চাদরের ভিতর নাক গুজিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিল না। দু'টি চোখ বাহির করিয়া দেখিল, মা কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন। উঁকি মারিয়া দেখিয়া দীপক একেবারে উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বরের মা মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, শোও, শোও বাবা—আবার অসুখ বেড়ে যাবে।

দীপক একেবারে বুড়ীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া বসিল, একটা গল্প বল ধাই-মা! আমার অসুখ সেরে গেছে।

বুড়ী ফোঁকলা দাঁতে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ওরে দুষ্টু মাষ্টারকে ফাঁকি দেওয়ার অসুখ!

দীপক আরও একটু ঘেঁষিয়া বুড়ীর বুকে মুখ লুকাইল। নীলাম্বরের মা'র বুকে সুধার সাগর উথলিয়া উঠিল।

গল্প আরম্ভ হইল—এক যে ছিল রাজা—

দীপক একবারও খোঁজ করিল না, কোথাকার রাজা, কি তার নাম, তার কত বয়স, দেখতে কেমন, কেমন করে সে কোথায় গেল?—শিশু হৃদয়ের সহজ রসানুভূতি তাহাকে রাজার সমস্ত পরিচয় ঐ একটি কথাতেই বুঝাইয়া দিল—এক যে ছিল রাজা!

দীপক যেন ঐ রাজাটিকে তাহার চোখের সামনে ঐ কাগজের নৌকায় চড়িয়া যাইতে দেখিল। কিছুক্ষণ আগেই সে আর মাধু মিলিয়া অনেকগুলি কাগজের নৌকা বানাইয়া ঘরের চালের নীচে যে জল জমিয়াছিল তাহাতে ভাসাইয়া দিয়াছে; খবরের কাগজের সেই বড় নৌকাটাতে নিশ্চয়ই রাজা চলিয়াছে, তাহার পেছনে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকায় লোকজন, পাত্র-মিত্র।

নীলাম্বরের মা বলিয়া চলিল, রাজা যুদ্ধে যাত্রা করবেন। সঙ্গে অনেক লোকজন। অনেক নদী, সমুদ্র পার হয়ে ত রাজা চললেন—

দীপক এবার বেশ সোজা হইয়া বসিল। চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

—রাজার সঙ্গে চল্লিশ হাজার সৈন্য আর দশহাজার নৌকো।

দীপক ভাবিল, নিশ্চয় আরও বেশী।

গল্প ফাঁদিয়া ফাঁদিয়া নীলাম্বরের মা অনেক দূর আসিয়াছে, এমন সময় মাধুরী ছুটি পাইয়া আসিয়া হাজির।

ধাই-মা, আমি গোড়া থেকে শুনি নি—গোড়াটা আমাকে একটু বলে দাও।

দীপক অসহিষ্ণুভাবে বলিল, গোড়ায় আর কি আছে? —এই একজন রাজা অনেক লোক-লস্কর নিয়ে অনেক-গুলি নৌকো করে' যুদ্ধে গিয়েছিল। এ রাজার সঙ্গে ছোট রাজাটা পারবে কেন? হেরে গেল! রাজা অমনি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সেই রাজাটাকে না বেঁধে এনে হাজির করল নিজের দেশে। বাপ্‌রে সে কি যুদ্ধ! এই তলোয়ারের ঝন্ ঝনানি, এই তীর ছোঁড়ার সোঁ সোঁ শব্দ, এই লোক পড়ে, এই লোক ছোটে—সে এক ব্যাপার, —হ্যাঁ তারপর বল ধাই-মা।

মাধুরী মাথা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, তোমার কথা শুনতে চাই না ছোড়্‌দা। ধাই-মা আমাকে বলবে।

দীপক মুরুব্বির চালে বলিল, যুদ্ধ ত কখনও দেখিস্ নি, বুঝ্‌বি কেমন করে? তোরা হাতা বেড়ী নিয়ে রান্না শেখ্‌গে যা, যুদ্ধ করে ছেলেরা, পুরুষরা—হাঃ! এক এক জন সৈন্য নয় ত এক একটা বড় বড় তাল গাছ! ইয়া তাদের মোটা মোটা হাতের কব্‌জী। আর তারা খায় কি! জল তেষ্টা পেলে এক বাল্‌তী ভিজানো চানাই অম্‌নি মুঠো করে' খেয়ে ফেল্‌লে। তারপর নদীতে না মুখ ডুবিয়ে দে টান্, দে টান্। দেখিস্‌নি আমাদের মকবুল কোচ্‌ম্যানটা কি করে? আমি দেখেছি। সকাল বেলা যেমন ঘোড়ার দানা নিয়ে গেল, অমনি আস্তাবলে গিয়ে এক মুঠো চানা আর একটু নুন্ তাতে দিয়ে একেবারে মুখে ফেলে দিলে। তারপরেই এক বদ্‌না জল চোঁ চোঁ করে মেরে দিলে। যেমন ছোলা খাওয়া অমনি গায়ে জোর! গোঁফে চাড়া দিয়ে ইয়া একটা বড় ঢেঁকুর তুলে ঘোড়ার দলাই-মলাই শুরু করে। ওকি আর সকাল বেলা রাঁধে বাড়ে? কিছুই না!—সেই সন্ধ্যের পরে ঘোড়ার সাজ খুলে, তাকে টহল্ দিয়ে তবে একবার পেটভরে ভাত খায়।—পুরুষমানুষ কি না—গায়ে জোর কত!

দাদার মুখের কথা শুনিয়া মাধুরী মন্-মরা হইয়া গিয়াছিল। সে ধাই-মা'কে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, ধাই-মা—রাজারা যখন মরে যেত তখন রাণীরা যুদ্ধ করত না?

নীলাম্বরের মা অমনি বলিল, করত বই কি? তা' আর করত না? সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছিলাম।

বল, বল ধাই-মা, দাদাকে একবার শুনিয়ে দাও ত।

দীপক হারে কি জিতে এই ভাবে খুব উৎসুক হইয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বরের মা বলিতে শুরু করিল।—সেবার রাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অসুখে পড়লেন। পিঠে তাঁর মস্ত বড় একটা ফোঁড়া। এতদিন ধরে পিঠে তুণ বেঁধে বেঁধে তাঁর পিঠে হয়ে গেল ঘা। রাজা রাজধানীতে এসে পড়লেন—বিছানায়!

দীপক অমনি বলিয়া উঠিল, দেখ্‌লি, দেখ্‌লি? হ্যাঁ, দিন্‌রাত তুণ বেঁধে বেঁধে পিঠে ঘা—তবু যুদ্ধ করছে! সে দিন আমার আঙুলটা কেটে গেল, অমনি চেপে ধরে দিলাম কষে' বেঁধে। তোরা হলে?—হুঁঃ, অম্‌নি—ভ্যাঁ!

এবার মাধুরীর অসহ্য লাগিল। বলিল, আচ্ছা ছোড়্‌-দা, তুমি খুব বীরপুরুষ, আমরা তা জানি। মাষ্টার মশাই ত চলে গেছেন, এখন আর কেন? আমাকে একটু গল্পটা শুনতে দাও।

দীপকের বড় অপমান বোধ হইল। সে তাচ্ছিল্য ভরে বলিল, যা—যা, তোদের মত ঘেঁতিয়ে ঘেঁতিয়ে পড়া মুখস্ত করা আমার পোষায় না। হাঁ, যেটুকু পড়্‌ব একেবারে খাঁটি।—আচ্ছা, দেখে নিস পরীক্ষার সময়।

মাধুরীও ছাড়িল না। সেও ঠোঁট ফুলাইয়া, গলা বাঁকাইয়া উত্তর করিল, হয়েছ না হয় একবার প্রথম। আমরাও কি হয় নি?

স্ত্রী-পুরুষের এই চিরন্তন্ বিবাদে রাজার গল্প ডুবিয়া গেল।

দীপকের মা আসিয়া কাণ্ড দেখিয়া অবাক্! জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ দীপু, মাথাধরা সেরে গেল! আমি ত তোর জন্যে দুধ-সাগু করতে বলে এলাম। যদি শেষ কালে জর-টর্ হয়!

দীপক আগেই মাথা নোয়াইয়াছিল, ছোটগলায় বলিল, আমার বুঝি সে রকম মাথা ধরেছিল!—তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

নীলাম্বরের মা গোল মিটাইয়া দিল। বলিল, দু'খানা না হয় গরম লুচি খাবে'খন্।

মাধুরী মুখ বাঁকাইয়া উঠিয়া গেল। যেন এই ভাব,—বাপ্‌রে ছেলের কি আদর!

সে রাত্রির মত গোলমাল মিটিয়া গেল। দীপক সকলের সঙ্গে বসিয়া ভাতই খাইল। খাওয়ার পর ভাই-বোনে মিলিয়া আবার গল্প জুড়িয়া দিল। এবার আর ঝগ্‌ড়া নয়, খুব ভাব।

(৬)

ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার জন্য দীপকের এবার নির্ব্বাসন ব্যবস্থা হইল। বিদেশে বোর্ডিং-এ থাকিয়া তাহাকে পড়াশুনা করিতে হইবে। বড় দাদার ব্যবস্থা।

দিন কাছাইয়া আসিল। যাইবার আগের দিনটিতে বিকাল বেলা দীপক তাহার নিজের তৈরী ছোট বাগানটিতে গিয়া দাঁড়াইল। ছোট্ট একটু জায়গা—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে হাত দশেক হইবে। তাহারই ভিতর মাটী খুঁড়িয়া ছোট একটি পুকুর তৈরী হইয়াছে। রোজ তাহাতে ঘটী করিয়া জল ঢালিতে হয়, নয় ত জল শুকাইয়া যায়। পুকুরের বাধান ঘাট,—ভাঙ্গা কাঁচের বাসনের টুক্‌রা দিয়া বাগানটির রাস্তার ধারে ধারে কেয়ারী বসান। মালীকে দিয়া ছোট ছোট মাছ ধরাইয়া দীপক তাহার নিজের পুকুরে জীয়াইয়া রাখে। ছোট ছোট ফুল গাছগুলিতে রোজ কোন্ পাতাটি নূতন অঙ্কুরিত হইল, কোন্ ফুলের কলিটির ক'টি পাপড়ি মেলিল, দীপক প্রতিদিন তাহা দেখিয়া রাখিত। সেই বাগানের কাছে আসিয়া দীপকের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মালীর মেয়ে চন্দা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দীপককে ভাবিতে দেখিয়া সে আদর করিয়া বলিল, ছোট্ট-দা বাবু, আপনি চলে গেলে আমি আপনার বাগান দেখ্‌ব। আপনি এসে দেখবেন, গাছ আরো কত বেড়েছে, ফুল আরও কত বেশী ফুটেছে।

দীপক ক্ষণেকের জন্য চন্দার মুখের দিকে তাকাইল। তারপর কি ভাবিয়া বলিল, ছোট কোদালটা একবার নিয়ে আয়্ ত চন্দা।

দাদাবাবুর সঙ্গে বাগানের কাজ করিতে পারিবে ভাবিয়া সে খুব আনন্দে ছুটিয়া গিয়া কোদাল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

দীপক ততক্ষণে পুকুরে হাত দিয়া ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া মাছগুলি তুলিয়া ঘটীতে রাখিয়াছে।

চন্দার হাত হইতে কোদাল লইয়া দীপক বাগানটাকে চোখের নিমেষে সমান করিয়া ফেলিল। গাছ, ঘাট, পাহাড়, কেয়ারী—সব মাটীর নীচে চাপা পড়িল। কোদালটা এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বার দুই হাতের ধূলাময়লা ঝারিয়া মাছগুলি লইয়া গিয়া বড় পুকুরে ছাড়িয়া দিল। মুখে তাহার তখন একটা পরম তৃপ্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চন্দা রাজপুরীর প্রহরীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কাছে আসিয়া দীপক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, চন্দা, কাল এতক্ষণে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। সে অনেক দূর—সেখানে যেতেই লাগে তিন দিন!

চন্দার চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

দীপক এবার আরো একটু নরম সুরে বলিল, দ্যাখ্ টম্‌টাকে একটু দেখিস্। ওকে যেন খেতে দেয়। না দিলে চাকরদের বকে' দিবি, নয় ত মাকে বলে দিস্। আর—আর—তুই খেতে না পেলে মা'র কাছে গিয়ে খেতে চাস্। অনেক ভাত আমাদের থাকে। তোদের ত রোজ রান্না হয় না।

দীপক বাগানে বাগানে ঘুরিতে লাগিল। প্রত্যেক ফলের গাছটি, ফুলের গাছটি তাহার জানা; বাড়ীর ভিতর দিয়া যে বড় নালাটা বরাবর পুকুরে গিয়া পড়িয়াছে, দীপক তাহার বাঁকে বাঁকে কতদিন বৃষ্টির দিনে ছাতা মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ঐ নালাটা ক'মাস একেবারে শুক্‌নোই থাকে। বর্ষার দিনে তার বুক ভরে' জল কল্ কল্ করে' ওঠে। দীপক সেই কলধ্বনির সঙ্গে কতদিন কত কথা বলিয়াছে। এই নালাটিকে তাহার কত ভাল লাগিত। জলভরা এই নালা, আশায় ভরা দীপকের প্রাণ! দীপক নালার জলে কত নৌকা ভাসাইয়া দিয়া দিক্‌দিগন্তরে পাঠাইয়া দিত। ছোট কাগজের ডিঙি স্রোতের মুখে পড়িয়া যখন নাচিতে নাচিতে আথালি পাথালি করিয়া যাইত দীপকের প্রাণ আনন্দে ফুলিয়া উঠিত। ঐ চলিয়া-যাওয়াটুকুই যেন সবখানি সত্য—তাহার পর কি আছে ভাবিবার অবসর নাই! দরকারও নাই!

বাগান ঘুরিয়া, নালা দেখিয়া সে দীঘির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড়দাদা যে ঝাউ গাছগুলি লাগাইয়াছিলেন, সেগুলি এখন প্রকাণ্ড হইয়াছে। দীর্ঘ বৎসর মাস ধরিয়া ঝড়ে জলে বড় হইয়াছে, আজ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দীপক তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল। সোঁ-সোঁ—ঝাউয়ের নিঃশ্বাস অবিশ্রান্ত কি কথা বলিতে চায়! দীপক একটু আগাইয়া গিয়া একটা ঝাউয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, আবার ফিরে আসব। তোমাদের কাছে বসে আবার দীঘির জলের খেলা দেখ্‌ব। পাড়ের এক কোণে বাঁশ ঝাড়ে কোঁ কোঁ করিয়া একটা বড় করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। দীপক সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। বাঁশের মাথাগুলি বাতাসের চাপে মাটীর দিকে নুইয়া আসিতেছে। কিন্তু একটু অবসর পাইলেই আবার তাহারা মাথা খাড়া করিতেছে! দীপক চোখ ফিরাইল।

ঐ যে দূরে কলাগাছের নূতন পাতাগুলি বাতাসের ঘায়ে পড়্ পড়্ করিয়া চিরিয়া গেল। কি রঙ ঐ পাতাগুলির!

অন্য দিকে টপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। সুপারী গাছের একটা শুক্‌নো খোল্ গাছ ছাড়িয়া মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে! রঙ নাই, প্রাণ নাই,—অসাড়, নিস্পন্দ, শুষ্ক, জীর্ণ পত্রখানি।

আবার ঐ যে দীঘির পাড়ে কাল বৃদ্ধ নিমগাছটা, তার গায়ে মাধবী লতাটা আজ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এক একবার ছোট ছোট বাতাসের দোলা আসে, টপ্ টপ্ টপ্—মাধবীর ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে।

ঘুরিতে ঘুরিতে দীপক আস্তাবলের দিকে গেল। চাঁদাটা এখন বড় হইয়াছে—সেও এখন গাড়ী টানে।

চাঁদা মাথাটা নোয়াইয়া চোখ দুটো ছোট করিয়া কি বুঝি ভাবিতেছিল। দীপক যাইতেই একবার পা-টা কাঠের উপর ঠুকিল। দীপক তার গায়ে হাত বুলাইয়া দিল। চাঁদার চোখের কোণ্ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে বোধ হয় অশ্রু নয়, আনন্দের স্নেহ-ধারা।

কাল সকালে আর সে কাহারও নয়, এরাও কেহ তাহার কাছে থাকিবে না। বিদায়ের ক্ষণটিকে সে ভাবিতে পারিল না, ভাবিতে চাহিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে তাহাদের বাড়ীর ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল। এইখানে বংশীর কোলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধে যাওয়া কত ঘোড়া-গরু দেখিয়াছে—। কই, তারা ত পেছন ফিরিয়াও একবার তাকাইত না! ফটকের দুই পাশে দু'টি মুসলমান ফকিরের কবর। বহুকাল ধরিয়া সেখানে আছে, আসল ইমারতটি এখনও খাড়া আছে। কবর দুটির গা ঘেঁসিয়া দু'টি কৃষ্ণচূড়া গাছ ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কত লোক এই কবর দুটিকে ভাঙিয়া ফেলিতে তাহার বাবাকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু কর্ত্তা তাহা শোনেন নাই। বরং কর্ত্তার হুকুম ছিল, প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ঐ কবর দুটির উপর বাতি দিতে হইবে। একজন মৌলবী প্রতি শুক্রবার আসিয়া ঐ কবরে বাতি দিত, তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিত।

কবরের গায়ে ছোট ঘাসফুল ফুটিয়াছে। কোথাও কোথাও সবুজ শ্যাওলা ধরিয়াছে। জংলী ফার্ণ গাছ মাঝে মাঝে কবরের ফাটল দিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল হরিৎ পত্র মেলিয়া কাল-মলিন স্তূপগুলির স্নিগ্ধতা বাড়াইয়া দিয়াছে।

দীপক অনেকদিন লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার বাবা যাতায়াতের সময় কবরগুলির দিকে চাহিয়া শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিতেন। দীপকও ধীরে ধীরে কবরের কাছে গিয়া নমস্কার করিল। বাবার কথা মনে পড়িতেই তাহার চোখে জল আসিল। সে অনুচ্চস্বরে বলিল, বাবা, আমার সঙ্গে যেও। আমার কাছে যে কেউ থাক্‌বে না!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘেরিয়া আসিয়াছে। দীপক ভাবিতে লাগিল, আর রাত্রি দিনের প্রভেদ থাকিবে না!

বাড়ীর ভেতরকার দরজার কাছে চন্দা দাঁড়াইয়াছিল, দীপক তাহাকে দেখিয়া বলিল, চন্দা, আমি একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। তোর বাবাকে বলিস্, সে যেন একটু চোখ রাখে। সেই যে পাগলটা মাঝে মাঝে আসে, আমাদের বাড়ীতে খায়, সে যেন কখনও এসে ফিরে না যায়। তুই দেখতে পেলে মাকে গিয়ে বলিস্, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তাকে খাওয়াস্, বুঝলি?

সন্ধ্যার অন্ধকার মিলাইয়া গিয়াছে। রাত্রির ম্লান জ্যোৎস্না তাহাদের বড় ঘরের বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সিমেণ্টের সিঁড়ির উপর দীপক গিয়া বসিল। মাধুরী আসিয়া কাছে বসিল।

মাধুরী জিজ্ঞাসা করিল, ছোড়্‌-দা, তোমার খুব ভাল লাগ্‌ছে না? কেমন দেশ দেখে আস্‌বে!

দীপক বলিল, হাঁ খুব। ইচ্ছে করছে আরো অনেক—অনেক দেশ ঘুরে আসি। কিন্তু এ ত তা নয়। এ ত বোর্ডিং-এ থাকা!

মাধুরী কথাটা বুঝিল না। দীপক বলিল, মাধু, তুই সেই গানটা গা ত। সেই যে, আমারই আশার বাতাসে আজ পৃথিবীর বুকে ঝড় উঠেছে, মানুষের মন আকুল, আমার মৃত্যু নাই—আশারও মৃত্যু নাই—

মাধু গান ধরিল। গানের সুরের আঘাতে জ্যোৎস্নার আলো কাঁপিতে লাগিল। দীপকের মা, দিদি, সকলেই আসিয়া হাজির।

সকলেরই মন যেন দীপকের বিদায় ব্যথায় কাতর।

দীপক তাঁহাদের সকলকে গল্প বলিয়া, হাসাইয়া মাত্ করিয়া রাখিল।

যাত্রার শুভক্ষণে নীলাম্বরের মা শুভচন্দনতিলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দীপককে বিদায় দিয়াছে। বংশী ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া ছল্ ছল্ চোখে ফিরিয়া গিয়াছে, বাড়ীর সকলেরই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া দীপক বিদায় লইয়াছে, টম্ কুকুরটা পর্য্যন্ত খানিকটা রাস্তা গাড়ীর পেছনে পেছনে ছুটিয়া আসিয়াছিল। গাড়ীর ভিতর হইতে দীপক মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছিল, টম্ কিছু দূর আসিয়া শেষকালে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে তাকাইয়া ছিল।

পথের একটা মোড় ফিরিতেই, চোখের সামনে গাড়ীর সব কিছু ঢাকা পড়িয়া গেল। বাহিরের দিকে যাহা কিছু দেখে সবই তাহার পিছনে পড়িয়া থাকে। যাহা এই মাত্র সম্মুখে দেখিল তাহাই চক্ষের নিমেষে পিছাইয়া গেল। কেবল সে নিজেই যেন সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সঙ্গে তাহার এক দাদা ছিলেন। তিনি তাহাকে দূর প্রবাসে রাখিয়া আসিবেন বলিয়া সঙ্গে চলিয়াছেন।

রেলগাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রভাতের বাতাস বিচ্ছিন্ন করিয়া রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। বাড়ী ও বাহিরের এই সকল ঘটনার সহিত যেন কোথাও সামঞ্জস্য নাই।

এই প্রথম বাড়ীর জন্য দীপকের মন আকুল হইয়া উঠিল। তাহাদেরই কামরায় কত যাত্রী, কত ভাবে শুইয়া, বসিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মত বাড়ী ছাড়িয়া দূর দেশে চলিয়াছে!

তাহার কাপড়ের খোঁটে মায়ের আশীর্ব্বাদী ফুল বাঁধা ছিল, দীপক নিজের অজ্ঞাতেই তাহা একবার মাথায় ঠেকাইল।

এক মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কাল বৈকালে তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌছাইবে।

—ক্রমশ

বৃদ্ধ পরীক্ষক

জাপানী কবি— আজুমি রিয়োসাই

অনুবাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু

স্বচ্ছ সুমিদা নদী কূলে কূলে ফোটে চেরী ফুল, জানি,
তরু-শাখে-ফোটা মঞ্জরী চেয়ে সুন্দরী নারীগণও
কাজল-চোখের মেঘেতে উজল হাসির বিজলী হানি'
সার বেঁধে চলে ; সারবান্ এক উপদেশ এবে শোনো।
আমি বলি তোমা—ওই অঞ্চলে যেয়ো না কখনো ভুলে
চেরী-ফুলরাশি ফুটে রহে যবে নীল সুমিদার কূলে।

শরৎ-নিশিতে শোভে যবে শশী গর্ব্বদীপ্তরুচি,
তটিনীর বুকে ছোট ঢেউগুলি সোনায় বদল করি' ;—
জ্যোছ্‌নারও চেয়ে শুভ্র এবং তুষারেরও চেয়ে শুচি
একটি মেয়ের সুন্দর মুখ ঝলিবে আঁধার ভরি ;
আমি বলি তোমা, পুঁথি লয়ে বসো নীরবে ঘরের কোণে,
জ্যোছনা-উজল নদীতটভূমে ভ্রমিয়ো না আন্‌মনে।

সেকালের সব মুনিঋষিগণ বহু সাধনার ফলে
লভিয়াছিলেন জ্ঞানযশভার সারাটি জীবন ভরি'।
তুমি কি ভেবেছ চাঁদের আলোর, ফুল-মঞ্জরীদলে
হেরিবার তব আছে অবসর ? নহে, যেই পথ ধরি'
গিয়েছেন তারা, সে কঠিন পথে তোমাকে ভ্রমিতে হ'বে,
সেই অনুরূপ ফল-লাভ তরে মনে যদি আশা র'বে।

তিরিশ বছর ধরি' মোর এই নিষ্প্রভ আঁখি দু'টি
ছাত্র দলের রচনা দেখেছে;—লক্ষ্য করেছে ভালো,
কে চলেছে পথে বীর-বিক্রমে, কে-ই বা পড়েছে লুটি',
কোথায় শ্রেষ্ঠ বিভায় জ্বলিয়া উঠেছে জ্ঞানের আলো।
দেখেছে বাসনা ক্ষমতা চেষ্টা—কত জীবনের ধারা
নষ্ট হইতে জ্যোছ্‌নায় চেরী-কুসুমেতে হ'তে সারা।

মীনকেতন

ন্যূট হাম্‌সুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পাঁচ

আরো লিখব? না, না। শুধু নিজেকে একটুখানি আনন্দ দিতে; আর দু'বছর আগে আমার বসন্ত কী রূপ নিয়ে এসেছিল, কি রকম দেখিয়েছিল সমস্ত সৃষ্টির চাউনি—তা লিখতে লিখতে আমার সময় বেশ সুখে কেটে যায়। মাটি আর সমুদ্র সুগন্ধের নিশ্বাস ফেল্‌ছে, বনের মরা পাতা থেকে একটি অপূর্ব্ব পচা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে; টুন্‌টুনিরা নীড় বাঁধবার জন্য ঠোঁটে ক'রে খড়কুটো নিয়ে ফুরফুরিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আরো দু'দিন কাট্‌ল, ঝর্ণাগুলি, ভ'রে ভ'রে ফেনিল হয়ে উঠেছে, দু একটা প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে, জেলেরা ইষ্টিশানে থেকে বাড়ী ফিরে চলেছে। সওদাগরের নৌকা দুটো মাছে বোঝাই হয়ে শুক্‌নো ডাঙায় এসে ভিড়্‌ল; যেখানে মাছগুলো শুকোতে দেওয়া হবে তাকে ঘিরে প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সাড়া প'ড়ে গেল হঠাৎ। আমার জান্‌লা দিয়ে আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কোনো কোলাহলই এই কুঁড়ের কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে না কিন্তু। আমি একা, এই একলাই আমাকে থাক্‌তে হ'ল। মাঝে মাঝে কেউ সমুখ দিয়ে চ'লে যায়। এভাকে দেখ্‌লাম, সেই কামারের মেয়ে; দেখ্‌লাম তার নাকে দুটি ব্রণ উঠেছে।

জিগে্‌গেস করলাম—"কোথায় যাচ্ছ?"

"জ্বালানি কাঠের খোঁজে।" ও মৃদুস্বরে বল্লে। কাট বেঁধে নেবার জন্য হাতে ওর একটা দড়ি, মাথায় শাদা একটি রুমাল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু ও ফিরে চাইল না।

তারপর অনেকদিন আর কাউকে আমি দেখিনি।

বসন্ত ডাকছে, সমস্ত বন কান পেতে সেই ডাক শুনছে। ভারি সুখ হয় যখন দেখি পাখীরা গাছের আগ্‌ডালে বসে' রৌদ্রের দিকে চেয়ে গান করছে। কোনো কোনোদিন আমি রাত দুটোতেই জেগে উঠি, ভোরবেলা পশু পাখীরা যে নির্ম্মল আনন্দটি অনুভব করে তারই স্বাদ পাবার জন্য।

বসন্ত হয়ত আমারো মনের দুয়ারে এসেছে, বারে বারে আমার রক্ত কার দু'টি পা ফেলার তালের মতো দুলে দুলে উঠ্‌ছে। আমি আমার কুটীরেই ব'সে থাকি, ছিপ্ সুতো বড়শীগুলি নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ব ভাবি, কিন্তু কাজ করবার জন্য একটি আঙুলও নাড়্‌তে ইচ্ছা করে না,—একটি রহস্যময় আনন্দদায়ক চাঞ্চল্য আমার মনের আগাগোড়া আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

হঠাৎ ঈশপটা লাফিয়ে উঠে গা মুড়ি দিয়ে একটুখানি ঘেউ করলে। কেউ কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে বুঝি। তাড়াতাড়ি টুপিটা টেনে ফেলে দিলাম, দোরের কাছে জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডার গলা শোনা যাচ্ছে। কোনো শিষ্টাচারের দাবী না ক'রে ও আর ডাক্তার ওদের কথা মতো করুণায় আমার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে।

"হাঁ"—আমি ওকে বল্‌তে শুন্‌লাম—"বাড়ীতেই আছে সে।" এই বলে' ও এগিয়ে এসে আমার হাতে ওর হাতখানি শিশুর অপার সরলতায় তুলে দিল। বল্লে—"আমরা কালকেও এসেছিলাম, কিন্তু তুমি বাড়ী ছিলে না তখন।"

আমার কাঠের তক্তপোষের ওপর ছেঁড়া ময়লা কম্বলটার ওপর বসে' ও কুঁড়ের চারিদিক চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ডাক্তার লম্বা বেঞ্চিটার ওপর আমার পাশে বস্‌ল।

আমরা কথা কইতে সুরু কর্‌লাম। খুব আরামের সঙ্গে গালগল্প চলতে লাগ্‌ল। কত কথা শোনালাম ওদের—এই বনে কত রকম জানোয়ার আছে, এই শীতে আমি কি কি জোগাড় করতে পারিনি। খালি বনমোরগই মিল্‌ল।

ডাক্তার বেশি কিছুই বল্লে না, শুধু আমার বন্দুকের ওপর মীনকেতনের একটি ছোট্ট ছবি আঁকা দেখে তার পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যাখ্যা সুরু কর্‌ল।

এডভার্ডা আচমকা জিগ্‌গেস কর্‌লে—"কিন্তু যখন কোন শীকার জোটেনা, কি ক'রে চালাও ?

"মাছ। মাছই বেশি। সব সময়ই কিছু না কিছু খাবার জুটে যায়।"

ও বল্লে—"কিন্তু খাওয়ার জন্য আমাদের ওখানেও ত' যেতে পার। এইখেনে এই কুঁড়েতেই গেল-বছর এক ইংরেজ ভাড়াটে ছিল, সে প্রায়ই আমাদের ওখানে খেতে যেত।"

এডভার্ডা আমার দিকে তাকাল, আমিও তাকালাম ওর দিকে। মনে হল একটি মধুর অভিনন্দনের ইঙ্গিত যেন আমার হৃদয় স্পর্শ কর্‌ছে। এইই যেন বসন্তের নির্ম্মল উজ্জ্বল প্রভাত! কি সুন্দর ওর ভুরু দুটির ভঙ্গিমা!

আমার এই ঘর সাজানো সম্বন্ধে কিছু বল্লে ও। দেখালে, পাখীর ডানা আর নানান্ রকম চামড়া টাঙিয়েছি, ভেতর থেকে এই ঘরটাকে একটা নোংরা গুহার মতোই দেখায়। ওর কিন্তু ভারি পছন্দ হয়েছে। বল্লে—"হাঁ, গুহাই বটে।"

এই অভ্যাগতদের দেবার মতো আমার কিছুই ত' নেই। ভাব্‌লাম, আমোদ করে' একটা পাখী ওদের সিদ্ধ করে' দিই, আঙুল দিয়ে শিকারীদের মতো ওরা খাক্। আমোদ পাবে।

পাখী একটা রাঁধ্‌লাম।

এডভার্ডা সেই ইংরেজের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল,—বুড়ো সঙ্কীর্ণচিত্ত, আপন মনে বিড়্‌বিড়্ ক'রে বকে। সে ছিল রোমান ক্যাথলিক, যখন যেখানে যেত লাল কালো আখর-ভরা একটা শোলোকের পুঁথি পকেটে নিয়ে।

ডাক্তার জিগ্‌গেস কর্‌লে—"সে তাহ'লে আইরিশ ছিল ?"

"আইরিশ ?"

"হাঁ। কেন না সে যে রোমান্ ক্যাথলিক।"

এড্‌ভার্ডার মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, থতমত খেয়ে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলে।

"হয়ত আইরিশই হবে"।

তারপর ও কিন্তু ওর প্রফুল্লতাটি হারিয়ে ফেল্‌লে। ওর জন্য আমার বড় দুঃখ হল। ব্যাপারটাকে সোজা করে দেবার জন্য বল্লাম—'না, তুমিই ঠিক। ইংরেজই ছিল সে। আইরিশরা নরওয়েতে বেড়াতে আসে না।'

একদিন নৌকায় করে' মাছ শুকোবার ক্ষেতগুলি সবাই দেখে আস্‌ব ঠিক হল...

যাবার পথে ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে এসে মাছ ধরবার যন্ত্রগুলা নিয়ে বস্‌লাম। দরজার ধারে পেরেকে আমার ঝাঁকি-জালটা ঝুল্‌ছে, মর্চেতে অনেক জায়গায় গেরোগুলি ছিঁড়ে গেছে। আমি স্ুঁচ ধার্ করে মেরামত করতে বস্‌লাম, অন্য জালগুলির পানে তাকাতে লগ্‌লাম। আজকে কাজ করা কি ভয়ঙ্কর বিশ্রী শক্ত লাগ্‌ছে। এই কাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—এম্‌নি নানান্ আজগুবি চিন্তা মনে খালি ভিড় করে আস্‌ছে যাচ্ছে; মনে হচ্ছে, জোম্‌ফ্রু এড্‌ভার্ডাকে বেঞ্চিতে জায়গা না দিয়ে সমস্তক্ষণ বিছানায় বসিয়ে রেখে অন্যায় করেছি। হঠাৎ ওকে যেন ফের্ দেখে ফেল্‌লাম—সেই রক্তাভ মুখখানি, সেই গলা, কোমর সরু কর্‌বার জন্য ওর ঘাঘ্‌রাটি সাম্‌নের দিকে খানিকটা নীচু করে দিয়েছে, ওর বুড়ো আঙুলটিতে যেন খুকীর সারল্যের স্নিগ্ধতা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। ওর আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চাম্‌ড়ার ছোট ছোট কুঁচকানিগুলি যেন করুণায় ভরা। ওর মুখখানি ডাগর একটা গোলাপের মতো, লাবণ্যে আঙুরের মতো টুল্‌টুল্ কর্‌ছে।

উঠে দরজা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিলাম না, শোন্‌বার কিছুই ছিলনা হয়ত। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। ইশপ ওর

বিশ্রামস্থান থেকে উঠে এল, বুঝ্‌লে—আমি কিছুর জন্য তারি চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

হঠাৎ মনে হল, ছুটে গিয়ে জোমফ্রে এডভার্ডের পিছু ধরে' ওর কাছ থেকে কিছু রেশমের সুতো চাই গে, আমার ছেঁড়া জাল সেলাই করবার জন্য! তাতে কোনই ত' ফাঁকি বা ছল থাকবে না, আমি এই জালটা নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাব মর্চেয় এ একেবারে ছিঁড়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল; আমার মাছ-ধরার মশ্‌লা রাখার বাক্সের মধ্যেই রেশমের সুতো আছে,—যা দরকার তার চেয়ে ঢের বেশি। ধীরে ধীরে ফিরে এলাম। নিজের কাছেই রেশমসুতো আছে বলেই মনটা ভারি দমে গেল।

ঘরে যখন ফিরে এলাম, কিসের একটি নিঃশ্বাস আমাকে স্পর্শ করল। মনে হল, এখানে আর আমি একলা নই।

—ক্রমশ

কবি ফেরদৌসী

মাহ্‌মদ-বীন-সবক্তগীন! এক প্রান্তে টাইগ্রিস শুনেছে তাঁর জয়গান—অপর প্রান্তে গঙ্গার ধবল তরঙ্গফেণায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর রণ-হুঙ্কার! মাহ্‌মদ-বীন্‌-সবক্তগীন।

রাজধানী গজ্‌নী শহরের রাজ-সভায় আজ বিপুল আয়োজন। ইরাণ, তুরাণ, ইস্পাহান, কত দেশ মাড়িয়ে আজ রাজ-সভায় লোক এসেছে।

ভুবন-বিজয়ী রণ-ক্লান্ত যোদ্ধার সাধ গিয়েছিল পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবের অত্যুজ্জ্বল কাহিনীর এক অভিনব মুক্তামালার রচনা দেখতে; তাই সে দিন দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে এক শুভদিনে ভুবন-বিজয়ী বীর সিংহাসনের পাশে ডাকলেন সিংহাসনের বহুদূরে তালপাতার পাণ্ডুলিপির নিভৃত আড়ালে যারা থাকে।

রাজা ডাকলেন কবিকে।

দিকে দিকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যে-কবি আপনার কাব্যের মধ্যে পারস্যের অতীত গৌরবের সমস্ত কাহিনীকে অমর-রেখায় আঁকতে পারবে—স্বয়ং মাহমদ্‌-বীন্‌-সবক্তগীন তাঁকে ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

রাজধানী থেকে বহুদূরে খোরাশান প্রদেশে তুস্‌ নগরে আবু-অল্‌-কাসেম নামে এক অজ্ঞাতনামা কবি বাস করত।

সেই নগরকে পরিক্রমণ করে যে নদী বইতো তারো নাম ছিল তুস্‌। প্রতি বর্ষায় নদীর জলরাশি কূল ছাপিয়ে উঠে নগর ভাসিয়ে নিয়ে যেত—প্রতি বর্ষায় সজল মেঘের দিকে ঘরহীন অসংখ্য সজল চোখ চেয়ে থাকত।

আবু-অল্‌-কাসেমের তালপাতার পাণ্ডুলিপি চোখের জলে রঙ বদলাতো। মসী-লিপি সহায় কবি অসহায় ভাবে ভাবতো—কেমন করে এই নদীকে বাঁধা যায়—কোথায় সে শক্তি—সে অর্থ!

এমন সময় তার কানে এল দূর গজ্‌নী থেকে রাজার

পুরস্কার ঘোষণার কথা। আর কাল বিলম্ব না করে আবু-আল-কাসেম গজ্‌নী রওনা হলেন। তরুণ কবির দুঃসাহসের সঙ্গে কে পারে পাল্লা দিতে?

গজ্‌নী শহরের বড় বড় কবিদের মধ্যে কোনও রকমে আবু-অল্‌-কাসেম একটু জায়গা করে নিলেন। একদিন রাজদরবারে আহ্বান এল।

আশা ও আশঙ্কায় তরুণ কবি সেদিন রাজসভায় প্রবেশ করে। চারিদিকে চোখে ব্যঙ্গ—; শিথিল ওষ্ঠে চারিদিকে করুণার হাসি!

নবাগত তরুণকে কে কবে এর চেয়ে বেশী আদর করেছে?

প্রবীণ কবিরা একে একে রাজার বন্দনা গান করলেন। সর্ব্ব শেষে ডাক এল তরুণ আবু-অল্‌-কাসেমের।

ইতিহাসকাররা জানেন যে, সেদিন গজনীর রাজ-সভায় একটা দুঃসাহসী তরুণ কবি নব-জন্মান্তর লাভ করে; সেদিন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফেরদৌসী জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজসভার বাইরে তুস্‌ নদীর ধারে যে ছিল আবু-অল্‌-কাসেম, গজনীর রাজ-সভায় সে-ই হ'ল ফেরদৌসী!

মাহ্‌মদ্‌ ফেরদৌসীর কবিতায় মুগ্ধ হলেন। আলাদা প্রাসাদে, বিপুল বিলাসে, ফেরদৌসী অবস্থান করতে লাগলেন। কোষাধ্যক্ষের উপর হুকুম হল—প্রত্যেক সহস্র কবিতা লেখা হলেই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা যেন কবিকে দেওয়া হয়।

ফেরদৌসী জানালেন যে, অত মুদ্রা তিনি হয়ত খরচ করে ফেলবেন, তাই কাব্য শেষ হলে সমস্ত টাকা তিনি একেবারে গ্রহণ করবেন।

রাজার স্নেহ-ছায়ায় ত্রিশ বছর কেটে গেল। ফেরদৌসী কাব্য-সুরায় মত্ত হয়ে ত্রিশ বছর ধরে শাহ্‌নামা রচনা করলেন—ষাট হাজার শ্লোকে। শাহ্‌নামার প্রথম শ্লোক যে লিখেছিল সে যুবক, শেষ শ্লোক যে লিখেছিল—সে বৃদ্ধ!

ত্রিশ বছরের মধ্যে কি না হয়? সমস্ত ইতিহাসের ধারা যে একবারে বদলে যায়! একটা রাজার মন বদলাবে—সে এমন বেশী কি!

গজনীর হতমান কবিদের যত্নে ও চেষ্টায় মাহ্‌মদ্‌-বীন্‌-সবক্তগীন—তাঁর প্রতিশ্রুতির সর্ত্ত ভুলে গেলেন।

শাহ্‌নামা পাঠে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা কবির কাছে পুরস্কার পাঠালেন—প্রতিশ্রুতি রাখলেন না।

মাহমদ্‌ যে পুরস্কার পাঠালেন তাতে হয়ত তুস্‌ নগরের নদী বাঁধা যেত—তাতে হয়ত আমরণ ফেরদৌসী সুখে দিন অতিবাহিত করতে পারতেন—কিন্তু কবির মন চিরদিনই এমনই দুর্বিনীত যে আপোষের কথায় সে অপমানিত বোধ করে; তার অন্তরকে যে অপমান করে—হোক্‌ না সে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর—কে সে?

দ্বারস্থ পুরস্কার-বাহকদের কাছ থেকে পুরস্কার নামিয়ে নিয়ে ফেরদৌসী তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিতরণ করে দিলেন—এবং বিমূঢ় দলপতিকে ডেকে বলে দিলেন—তোমার সুলতানকে জানিও যে, ফেরদৌসী কোনও সুলতানের করুণার পাত্র নয়!

গজনী নগরে বসে সুলতান্‌ মাহ্‌মদ-বীন্‌-সবুক্তগীনের পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া!

সুলতানের কানে সংবাদ পৌছল।

ক্রোধে উন্মাদ হয়ে সুলতান্‌ হুকুম দিলেন, কালই কারাগারে দুর্বিনীতকে বন্দী করে হাতীর পায়ের তলায় যেন ফেলে দেওয়া হয়!

কোথায় ষাট সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আর কোথায় এই অসহ মৃত্যু!

ফেরদৌসীর কানে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা পৌছল। তুসের পথে মরুভূমি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে! সে-ই তো কবির বিরামাগার—এ বিলাস কি তাকে সাজে!

কিন্তু পালাবার আগে ফেরদৌসী ভাবলেন যে, আমার মহাকাব্যের শেষ পাতা তো এখনো লেখা হয় নি—এ বিরোধ থেকে অনাগত সমস্ত কবিকে সাবধান করে দিয়ে যাব! শাহ্‌নামার শেষ পাতা লিখতে হবে।

পরের দিন সকাল বেলা ফেরদৌসী স্বয়ং রাজসভায়

উপস্থিত হয়ে—অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে বন্দনায় বন্দনায় রাজার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

মিনতির সুরে রাজার দয়া হল। মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নিলেন।

তখন বিনীতভাবে ফেরদৌসী জানালেন যে, তিনি শাহ্‌নামার পাণ্ডুলিপি আর একবার দেখে দেবেন—জায়গায় জায়গায় দু'একটী ত্রুটি আছে।

রাজাজ্ঞায় পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে এনে শাহ্‌নামার শেষ-পাতা লিখ্‌লেন। অক্ষয় অক্ষরে সেখানে ফেরদৌসী সমস্ত অন্যায়ের কথা তীব্র ভাবে লিখে রাখলেন—যাতে অনাগত কাল তাঁর লেখা থেকে শিক্ষা পায়।

ফেরদৌসী অমর করে লিখে রাখলেন—হে সুলতান, মত্ত হস্তীর পদতলে আমাকে ফেলতে চাও—কিন্তু জান না কবির অন্তর কত শত প্রমত্ত মাতঙ্গের বল ধরে।

সেই দিন গজনী শহরের এক মসজিদ্‌-গাত্রে তিনি লিখে রাখলেন—গজনীপতির সভায় অনেক সাধু সভাজন, বিদ্বান, জ্ঞানী—সমুদ্রের রত্নের মত তাঁরা সমুদ্রের অতল গহ্বর আলোকিত করছেন; কিন্তু আমি অভাজন সে সাগরে জাল ফেলে একটীও রত্ন তুলতে পারলাম না—সাগরের কি দোষ, আমারই কপাল।

সেই রাত্রে ফেরদৌসী গজনী নগর পরিত্যাগ করে জন্মভূমির মরুপথের দিকে যাত্রা করেন।

মরুপ্রান্তর বেয়ে অসংখ্য উটের শ্রেণী চলেছে—সঙ্গে চলে লোক লস্কর। উটের পিঠে বোঝাই-করা স্বর্ণমুদ্রা, বিবিধ উপহার।

শ্রান্ত বাহকবৃন্দ এক মরু-উদ্যানে এসে দাঁড়ালো। পাশ দিয়ে কয়েকজন লোক একটী মৃত-দেহ বহন করে নিয়ে চলেছে।

একজন বাহক জিজ্ঞাসা করল—বলতে পারো এখানে কোথায় ফেরদৌসী তুসীকে পাওয়া যায়?

শব-বাহকদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

—অনুতপ্ত সুলতান আজ গজনীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ জিনিস কবিকে পাঠিয়েছেন—আমরা তাই নিয়ে চলেছি।

শব বাহক উত্তর দিল—আজ ফেরদৌসী বহুদূরে চলে গেছেন—গজনী থেকে—সুলতান থেকে—বহুদূরে। আমরা শুধু তাঁর মৃতদেহ এই কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছি।

স্থানাভাবে এবার "ডাকঘর" দেওয়া গেল না।

তৃতীয় খণ্ড

রমঁ্যা রলাঁ

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী

ক্রিস্‌তফ্ ও মিন্না পরস্পরের প্রতীক্ষায় থাকে; দুজনে দুজনকে লক্ষ্য করে, উভয়ে উভয়কে নিবিড় ভাবে চায় অথচ ভয় করে। কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে দুজনের দিন কাটে, ছোটখাট ঝগড়া ও রাগারাগী থামে না কিন্তু কাছাকাছি ভাবটা যেন চলিয়া গিয়াছে—দুজনেই যেন কি বলিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ প্রত্যেকেই নিজের খেয়ালমত প্রেমকে নীরবে প্রাণের মধ্যে গড়িয়া তুলিতেছে।

প্রেম সজাগ হইবামাত্র পিছন পানে তাকায়; মিন্নাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াই ক্রিস্‌তফ আবিষ্কার করিল, সে যেন চিরদিনই তাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে! তিন মাস ধরিয়া প্রত্যহ দুজনে দুজনকে দেখিতেছে অথচ কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, প্রেম জাগিয়া উঠিতেছে। যে দিন ভালবাসিল সেই দিন হইতেই তারা বিশ্বাস করিল যে, তাদের প্রেম চিরকালের।

কাকে ভালবাসি? এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় ক্রিস্‌তফের লাভ হইল। সে এতকাল ভালবাসিয়াছে অথচ জানিত না কে তার ভালবাসার ধন! এখন একটা মস্ত সান্ত্বনা যে, সবটা স্পষ্ট হইয়াছে; অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট একটা যাতনা অপেক্ষা শরীরের একটা বিশেষ স্থানে তীব্র যন্ত্রণা যেন ভাল; প্রেম আছে অথচ প্রেমাস্পদকে জানা নাই—এ বড় বিষম রোগ—ইহা প্রচ্ছন্ন জ্বরের মত মানুষের ভিতরটা খাইতে থাকে। প্রবৃত্তির বেগে মানুষ বাড়াবাড়ি করিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিতে পারে, কিন্তু সেটা সজ্ঞানে হয়, তার কারণ জানা থাকে; সেটা অজানা ক্ষয়রোগের চেয়ে ভাল; শূন্যের চেয়ে আর যাহা কিছু আছে সবই যেন ভাল বোধ হয়।

মিন্না ক্রিস্‌তফ্‌কে যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছে। সে যে তার প্রতি উদাসীন নয়, তাহা ক্রিস্‌তফ্ বেশ জানে। তবুও সে কল্পনা করে যেন সর্ব্বত্রই একটা উপেক্ষার ব্যবধান রহিয়াছে। এই কল্পনা তাহাকে বিষম পীড়া দেয়। তবুও ইহা হইতে সে নিষ্কৃতি পায় না। আসলে মিন্না বা ক্রিস্‌তফ্ পরস্পরকে এ পর্য্যন্ত মোটেই ভাল করিয়া চিনিত না। এখন সেই অপরিচয়টা যেন বিষম বাড়িয়া উঠিল। তাদের ধারণাগুলা সবই যেন গোলমেলে—অলীক, মিথ্যা। অদ্ভুত কল্পনার তোড়ে তারা সর্ব্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলে, এবং সর্ব্বদাই দেখে—হিসাবে গরমিল। এমন সব মনগড়া দোষগুণ তারা পরস্পরের উপর চাপায়, যাহার অস্তিত্ব কোথাও নাই। আসলে তাহারা জানেই না যে, তাহারা কি চায়। ক্রিস্‌তফের প্রেম একটি আকার লইয়াছে, যাহার মধ্যে তার স্নেহের ক্ষুধা তার প্রতিদানের পিপাসা তার আশৈশবের উন্মাদনা যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া দয়িতকে লুট করিয়া লইতে চায়। এই দুর্দ্দম বাসনা কখনও আবার পূর্ণ আত্মদানের প্রেরণা জাগাইয়া তোলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা পাশবিক ক্ষুধা, একটা অস্পষ্ট তৃষ্ণা তাহাকে যেন উন্মত্ত করিয়া তোলে। সে বুঝিতে পারে না, সেই ঘূর্ণী পাকে পড়িয়া কি করিবে।

মিন্নার কাছে প্রেম যেন অসীম ঔৎসুক্যরূপে দেখা দিয়াছে, এই যে রহস্যলোকে প্রবেশাধিকার মিলিয়াছে তাহাতেই সে সুখী, তাহা হইতে যতটা সুখ পাওয়া সম্ভব তাহা সে যেন নিঙড়াইয়া লইতে চায়। তার আত্মগরিমা, তা'র ভাবোন্মাদনা ইহাতেই পরিতৃপ্ত হয়। সে যতটুকু অনুভব করে, তা'র শতগুণ পুলক-বেদনা আরোপ করিয়া আত্ম-প্রতারণা করে, এবং সেই প্রতারণাই তা'র পরম সুখ।

এই প্রেমের অনেকখানিই পুঁথিগত ব্যাপার। কোথায় কি পড়িয়াছে, কি শুনিয়াছে, অমনি সেটিকে নিজেদের কাল্পনিক প্রেমের হারে গাঁথিয়া লয়।

এই সব ছোটখাট মিথ্যা, তুচ্ছ অহমিকা একদিন রুদ্র প্রেমের ঝঞ্ঝাবাতে ধূলায় লুটাইল। সত্য প্রেমের অমর দীপ্তিতে সমস্ত প্রাণ ভরিয়া গেল। সে কবে? কেমন করিয়া হইল? একদিনে—একদণ্ডে—একটি অনন্ত মুহূর্ত্তে সকল প্রত্যাশা ছাপাইয়া দেখা দিল এই চাওয়ার অতীত প্রেম।

একদিন দু'জনে বসিয়াছে। ঘরটি অন্ধকার। নিরালায় দুজনে কথা কহিতেছে। সে কথার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা গম্ভীর সুর বাজিয়া উঠিল, জীবন কি? মৃত্যু কি? মরণের পারে আরও কিছু অনন্ত অমৃত বস্তু আছে কি? ভালবাসা-বাসির ছেলেমানুষীকে হঠাৎ কে যেন একটা বড় সত্যের পটভূমিকায় বসাইয়া দিল। মিন্না দুঃখ করিতেছিল যে, সে বড় একা। ক্রিস্তফ্ তাহাকে বুঝাইতেছিল যে, সে যতটা একা ভাবে বাস্তবিক সে ততটা নয়! মাথা নাড়িয়া মিন্না যেন আপন মনে বলিয়া গেল,—না ক্রিস্তফ্, আমরা শুধু কথা নিয়ে খেলা করছি। যে যার জীবন নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। কে কার খোঁজ রাখে? ভালবাসা! নিস্তব্ধ!

হঠাৎ ক্রিস্তফ্ আবেগে অধীর হইয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মিন্না—আমি?

মন্ত্রমুগ্ধের মত মিন্না ছুটিয়া গিয়া ক্রিস্তফের হাত ধরিল।

বিষম জোরে দরজা খুলিয়া গেল। সাম্নে মিন্নার মা। ওল্টান বইখানার উপর ক্রিস্তফ্ ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ লুকাইল। পরিত্যক্ত সেলাইটা মিন্না সুরু করিতে গেল, আঙুলে ছুঁচ অনেক বার বিঁধিল! সেলাই কি হইল—সেই জানে।

সারা সন্ধ্যায় আর তাহারা নিরালায় মিলিল না। একা একা মিলিতে কেমন যেন তাহাদের ভয় করে। কি একটা জিনিষ দরকার পড়িতে মিন্নার মা অন্য ঘরে খুঁজিতে যাইবেন, হঠাৎ মিন্না সে জিনিষটা আনিতে ছুটিল। এমন কাজের মেয়ে মিন্না কোন কালেও ছিল না! মিন্না সরিতেই ক্রিস্তফও বাহিরে আসিয়া যেন বাঁচিল।

পরের দিন আবার দেখা, যে কথায় বাধা পড়িয়াছে সেই কথাটি তুলিতে দুজনেই চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা জমিল না। কথার সুযোগ যে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু ক্রিস্তফ্ কেন যেন কিছু বলিতেই পারে না, যেন সে চেষ্টা করিয়া দূরে দূরে থাকিতে চায়। যদিও বা সে একটু কথা তুলিতে চেষ্টা করিল, মিন্নার অভিমান ঔদাসিন্যের তুষার আবরণ রূপে আসিয়া যেন সব জমাইয়া দিল।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। দুজনেরই সন্দেহ জাগিতেছে—দুজনেই ভুল করিয়াছে নাকি? সেদিনকার সন্ধ্যার সেই অপূর্ব্ব একটি মুহূর্ত্ত, সে কি সত্য? না, স্বপ্ন? মিন্না ক্রিস্তফের উপর চটিয়া আগুন। ক্রিস্তফ্ তার সঙ্গে একা দেখা করিতে ভয় পায়। এমন দূরত্ব, এমন ঔদাসীন্য বুঝি কখনও তাহাদের মধ্যে ছিল না।

—ক্রমশ

Published by Sj. Dineshranjan Das from 10-2, Patuatola Lane and Printed by K. P. Das, at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rosio Lane, Calcutta.

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু [আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে

কল্লোল

আষাঢ়, ১৩৩৪

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে

নজরুল ইস্‌লাম

আজি হতে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে,
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে।
ধেয়ানী গো রহস্য-দুলাল।
উতারি বোর্‌কাখানি তোমার আঁখির আগে
কবে এল সুদূর আড়াল ?
অনাগত-আমাদের দখিন-দুয়ারী
বাতায়ন খুলি তুমি, হে গোপন হে স্বপনচারী,
এসেছিলে বসন্তের গন্ধবহ-সাথে
শত বর্ষ পরে যথা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি রাতে।
নেহারিলে বেদনা-উজ্জ্বল আঁখি-নীরে,
আনমনা-প্রজাপতি-নীরব-পাখায়
উদাসীন গেলে ধীরে ফিরে।

আজি মোরা শত বর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে।
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ইঙ্গিত-গান
সজল নয়নে।

আজো হায়
বারেবারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরি গুমরি কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্ম্মরে !
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল
পড়ে ঝ'রে ঝ'রে।
ঝিরিঝিরি কাঁপে কালো নয়ন-পল্লব,
মধুপের মুখ হ'তে কাড়িয়া মধুপী পিয়ে পরাগ-আসব !
কপোতের চঞ্চুপুটে কপোতীর হারায় কূজন,
পরিয়াছে বনবধূ যৌবন-আরক্তিম কিংশুক-বসন !
রহিয়া রহিয়া আজো ধরণীর হিয়া
সমীর-উচ্ছ্বাসে কেন ওঠে নিঃশ্বসিয়া !

তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি, হে কবীন্দ্র,
অনুরাগ-ভরে !
আজি এই মদালসা ফাগুন-নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে !
চতুরালি ! ধরিয়াছি তোমার চাতুরী ;
করি চুরি
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে,
কাব্য হয়ে গান হয়ে সিক্ত কণ্ঠে রঙীলা স্বপনে !

আজিকার যত ফুল—বিহঙ্গের যত গান
যত রক্তরাগ
তব অনুরাগ হ'তে, হে চির-কিশোর কবি,
আনিয়াছে ভাগ।

আজি নববসন্তের প্রভাত-বেলায়
গান হয়ে মাতিয়াছ আমাদের যৌবন-মেলায়।
আনন্দ-দুলাল ওগো হে চির-অমর।
তরুণ তরুণী মোরা জাগিতেছি আজি তব
মাধবী বাসর।
যত গান গাহিয়াছ ফুল-ফোটা রাতে—
সবগুলি তার
একবার—তা'পর আবার
প্রিয়া গাহে আমি গাহি, আমি গাহি প্রিয়া গাহে সাথে।
গান-শেষে অর্দ্ধরাতে স্বপনেতে শুনি
কাঁদে প্রিয়া, "ওগো কবি ওগো বন্ধু ওগো মোর গুণী—"
স্বপ্ন যায় থামি
দেখি, বন্ধু, আসিয়াছ সজল নয়নপাতে
অশ্রু হয়ে নামি।

মনে লাগে শত বর্ষ আগে
তুমি জাগ—তব সাথে আরো কেহ জাগে
দূরে কোন্ ঝিলিমিলি-তলে
লুলিত অঞ্চলে।
তোমার ইঙ্গিতখানি সঙ্গীতের করুণ পাখায়
উড়ে যেতে যেতে সেই বাতায়নে ক্ষণিক তাকায়,
ছুঁয়ে যায় আঁখি-জল-রেখা
নুয়ে যায় অলক-কুসুম,
তারপর যায় হারাইয়া—তুমি একা বসিয়া নিঝ্ঝুম।
সে কাহার আঁখি-নীর-শিশির লাগিয়া
মুকুলিকা বাণী তব কোনটি বা ওঠে মুঞ্জরিয়া,
কোনটি বা তখনো গুঞ্জরি ফেরে মনে
গোপনে স্বপনে।

সহসা খুলিয়া গেল দ্বার
আজিকার বসন্ত প্রভাতখানি দাঁড়াল করিয়া নমস্কার।
শত বর্ষ আগেকার তোমারি সে বাসন্তিকা দূতী
আজি নব নবীনেরে জানায় আকুতি।...

হে কবি-শাহান শাহ্! তোমারে দেখিনি মোরা,
সৃজিয়াছ যে তাজমহল—
শ্বেত চন্দনের ফোঁটা কালের কপালে ঝলমল—
বিস্ময়-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরি,
যৌবনেরে অভিশাপি—"কেন তুই শত বর্ষ করিলিরে দেরী?"
হায় মোরা আজ
মোমতাজে দেখিনি, শুধু দেখিতেছি তাজ।

শত বর্ষ পরে আজি হে কবি-সম্রাট
এসেছে নূতন কবি—করিতেছে তব নান্দী পাঠ।
উদয়াস্ত জুড়ি আজো তব
কত না বন্দনা-ঋক ধ্বনিয়া উঠিছে নব নব।
তোমারি সে হারা-সুরখানি
নববেণু-কুঞ্জ-ছায়ে বিকশিয়া তোলে নববাণী।
আজি তব বরে
শত বেণু বীণা বাজে আমাদের ঘরে।
তবুও পুরে না হিয়া ভরেনাক' প্রাণ,
শত বর্ষ সাঁতরিয়া ভেসে আসে স্বপ্নে তব গান।
মনে হয়, কবি,
আজো আছ অস্তপাট আলো করি
আমাদেরি রবি।

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
যে-অভিবাদন তুমি করেছিলে নবীনেরে
রাঙা অনুরাগে,
সে-অভিবাদনখানি আজি ফিরে চলে
প্রণামী-কমল হয়ে তব পদতলে।
মনে হয়, আসিয়াছ অপূর্ণের রূপে
ওগো পূর্ণ! আমাদের মাঝে চুপে চুপে!
আজ এই অপূর্ণের কম্প্রকণ্ঠস্বরে
তোমারি বসন্ত-গান গাহি তব বসন্ত-বাসরে
তোমা হ'তে শত বর্ষ পরে।

১৭ই বৈশাখ,
১৩৩৪

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীদেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

হঙ্ কঙ্ ব্যাঙ্কের ক্যাশে ভূপেন নূতন কাজ পাইলেও সকলেই তাহাকে জানিয়া গিয়াছিল। কাজের প্রথম দিনই ক্যাশের বড়বাবু সতীশ সরকার সবাইকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "ওহে, তোমরা একে বেশী ঘাঁটিও না! বেচারীর মৃগীর ব্যারাম আছে। একটু খেয়ালি লোক। কোন রকমে গোলমাল টোলমাল হলেই হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তখন চাকরিটি রাখা দায় হবে।" একথা আফিস ময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। ছুটি হইতেই একাউণ্টের রাম মিত্তির সতীশ বাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি হ্যাঁ হে, শেষে ভাগ্নে বলে কি আফিসে পাগল ছাগল ঢোকালে নাকি?" সতীশ বাবু বলিলেন, "কি আর করি বল? আপন খুড়তুতো বোনের ছেলে। বাপটি ত বদ্ধ পাগল। সংসার চালায় কি ক'রে? আর তাছাড়া, পাগল ও নয়। কাজ কর্ম্মে ও খুব ঠিক। এই ত এতদিন রায়েদের বাড়ী টুইশনি করে সংসার চালাচ্ছিল, কোন গোলমালই ত হয় নি। ছেলেবেলা থেকে আমি দেখে আসছি। আমার বোন মরার পর থেকে ত ও প্রায় আমাদের বাড়ীতেই থাকত। ভূতের গল্প শুনতে কি ভালই বাসত! লেখা পড়াতেই কি আর খারাপ ছিল? এমন আশ্চর্য্য পড়ার ঝোঁক রাম-দা, দেখাই যায় না। তবে ওর কপাল খারাপ, দশ বছর বয়সে কি ব্যামোই বাধাল যে, দু-দুবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। না, না, কাজ ও ঠিক করতে পারবে। সংসার দেখছি আজ পঞ্চাশ বছর—অকেজো লোককে দিয়ে কাজ করানর বেকুবি আমি করব না, সে তুমি ঠিক জেনো।" তারপর প্রত্যেক দিন ভূপেন কাজ করিয়া যাইত এবং এই স্বল্পভাষী অন্যমনস্ক যুবকটির নিকট বড়-বাবুর কথা এড়াইয়া কাহাকেও ঘেঁসিতে দেখা যাইত না।

বাঙলা দেশে মুমূর্ষুরও বিবাহের ক'নের অভাব হয় না, সুতরাং ভূপেনের বিবাহ হইয়াছিল। বধূ আশা অতি দরিদ্র গৃহস্থের মেয়ে, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বিবাহে ভাবী জামাতা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ করা আবশ্যক মনে করেন নাই বরং শাশুড়ী না থাকা ও শ্বশুরের পাগল হওয়াটা সুবিধা হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন। পাড়ার লোকদের বলিয়া-ছিলেন, "বিবাহের খরচ কিছু করতে হচ্ছে না, কেবল আমার মেয়ে অত সুন্দরী বলে;—নইলে বনেদি ঘর, ধরতে গেলে কলকাতার ওপরেই বাড়ী, এ কি আর আজকাল সহজে মেলে! আর শ্বশুর পাগল, তাতে আর কি হয়েছে? এই ও বাড়ীর মেজকর্ত্তা পাগল, তাই বলে কি ওর ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে না—না, তাদের বাড়ীর বউরা খুব অসুখী আছে?...

বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সময় স্বামীর শূন্য দৃষ্টি ও রুক্ষ চেহারা দেখিয়া আশার মনে অনেক অশুভ আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। তারপর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিতে পথে ষ্টীমারে উঠিয়াই স্বামী যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ও শ্বশুরবাড়ীতে দিনের পর দিন শ্বশুরের উন্মত্ত হাস্য শুনা যাইতে লাগিল—তখন সে বুঝিল যে, এই নির্জ্জন জীর্ণ গৃহের ন্যায় তাহার ভবিষ্যত কোন্ দিন ভাঙিয়া পড়িবে। বিশেষ করিয়া তাহার ভয় হইত ভূপেনের জন্য। ভূপেন

তাহাকে যে ভালবাসিত না এমন নয়—তাহার ব্যবহারের কোথাও বিশেষ ত্রুটিও থাকিত না—তবু অর্দ্ধ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যখন সে দেখিত বই-এর পাতার উপর বদ্ধ মুষ্টি রাখিয়া ভূপেন জানালার বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে, তখন সেই চক্ষুর অর্থহীন ভাস্বরতায় তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। সে কথা কহিত অল্প, কিন্তু এক একদিন যেন তাহার ভিতর উন্মাদনা আসিত। কত অদ্ভুত গল্পই সে বলিত। জনশূন্য পুরীর তন্দ্রাহীন সুন্দরী, পরিত্যক্ত নগরীর আঁধারগামী পথভ্রষ্ট পথিক,—শুনিতে শুনিতে আশা সভয়ে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইত। ভূপেন তাহাকে অভয় দিয়া বলিত "তুমি এত সুন্দর, তোমার ভয় কি?" বলিয়াই আবার আরম্ভ করিত—পাতাল কক্ষের মৃত্যুবিভীষিকার কথা। আশা এক একদিন স্বামীকে বলিত, "হ্যাগো, ওই ছাইপাঁশ কি একরাশ পড়ো, ওতে মাথা আরো খারাপ হয়ে যায়।" ভূপেন শুষ্ক হাসি হাসিয়া জবাব দিত, "ও ছাড়া আর করবার মত কী বা আছে?" যেদিন স্বামীর অপস্মারের আক্রমণ হইত—গভীর রাত্রে অবসন্নদেহ স্বামীকে বাতাস করিতে করিতে বাড়ীর পিছনে অন্ধকারাবৃত ভগ্ন অট্টালিকার দিকে চাহিয়া আশার মনে হইত যেন তাহার সমস্ত শ্বশুরবাড়ী একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন—তাহার শ্বশুরের বিরামহীন পদচারণা ও বিকৃত হাস্য,—তাহার রুগ্ন স্বামীর নীরব আত্মমগ্ন গতিবিধি,—তাহাদের গৃহ ও গৃহের আশ পাশ সবই যেন কোন্ কুহকরাজ্যের। এ রাজ্যে আনন্দ নাই, নিরানন্দ নাই, আশা নাই, নৈরাশ্য নাই, আছে শুধু অখণ্ড নীরবতার পাষাণ চাপ—অতল গর্ভত্রাসের সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার।

(২)

কিছুদিন হইতে ভূপেনের শরীর বড় ভাল ছিল না। মাথার যন্ত্রণায় রাত্রে ভাল ঘুম হইত না। তাহার উপর আফিসে বড় বেশী খাটিতে হইতেছিল। এ মাসে পাটের মরসুম—কাজেই ব্যাঙ্কের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে রাশি রাশি হিসাব লিখিয়া ঠিক করিতে হইত, টিফিনের অবসরটুকুও পাওয়া যাইত না। ক্যাশের কাজ বলিয়া ভূপেন একটু সকাল সকাল ছুটি পাইত বটে কিন্তু আসিতে হইত দশটার মধ্যেই। আশা প্রত্যহ স্বামীকে বলিত, "ওগো, এই শরীর, দুচার দিন ছুটি নাও। এ রকম খাটুনি সইতে পারবে কেন? আফিস থেকে ফিরে এলে তোমায় দেখলে যে ভয় হয়।" ভূপেন মনে করিত ছুটি চাহিবে, কিন্তু অত কাজের ভিড়ে সাহেবের কাছে বলিবার মত সাহস হইত না। সুতরাং দিনের পর দিন পরিশ্রমে তাহার অসুস্থদেহ আরও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিল।

একদিন ছুটির পর বাহিরে আসিতে নিজেকে ভূপেনের অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে হইতে লাগিল। ক্ষীণ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিতেছে এমন সময় ফুটপাথের ওধার হইতে কে যেন ডাকিল, "বাবু!" ভূপেন ফিরিয়া দেখিল, পুরাতন পুস্তকওয়ালা, তাহাকে বই দেখিতে ডাকিতেছে। "লিন্ বাবু, ভাল ভাল কিতাব আছে। আংরেজি, বাংলা, রোবিবাবু—সোব আছে—লিন্ না।" লোকটি ভূপেনের পরিচিত। আফিস্ হইতে ফিরিবার পথে প্রায়ই সে ইহার কাছে বই কিনিত—বেশীর ভাগই ছ'পেনি সিরিজের রোমাঞ্চকারী উপন্যাস। পুস্তকওয়ালা বলিল, "বাবু, আজ আপনার জন্যে একটা রোবিবাবুর কিতাব রেখে দিছি। আটআনা পড়বে। খুব ভাল বই।" বলিয়া অর্দ্ধছিন্ন একখানা 'গল্পগুচ্ছ' ভূপেনের সামনে ধরিল। ভূপেন বড় একটা বাঙলা বই পড়িত না। নাম শুনিয়া একবার শরৎবাবুর একখানা পড়িতে গিয়া সে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। আজ কি মনে করিয়া সে বইখানা কিনিয়া ফেলিল।

বাড়ী ফিরিয়া সে দিন তাহার অবসাদ খুবই বাড়িয়া গেল; সুতরাং আশা স্বামীকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিতে ভূপেন সন্ধ্যার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে ভূপেনের মনে হইল, তাহার মাথার ভিতর কে যেন হাতুড়ি দিয়া পিটিতেছে। ভয়ানক ভার। একবার মনে হইল আজ আর আফিসে যাইবে না, কিন্তু ভয় হইল—মাথাধরার অজুহাতে অনুপস্থিত হওয়া বোধ হয় চলিবে না। পাছে আশা চিন্তিত হয় বলিয়া তাহাকে কিছু জানাইল না। ন'টার মধ্যে ক্ষুধা-

বিহীন মুখে খাইবার একটা অভিনয় করিয়া আফিসের দিকে চলিল।

আজ আর হাঁটিয়া যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না—কোন রকমে শিয়ালদহের মোড়ে আসিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিল। পয়সা দিবার জন্য পকেটে হাত দিয়া দেখে, পকেটে আগের দিনের বইখানা রহিয়াছে। বইখানা ধীরে ধীরে বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতেই একটা গল্পের দিকে নজর পড়িল, —ক্ষুধিত পাষাণ! কি মনে করিয়া ভূপেন গল্পটি পড়িতে আরম্ভ করিল।

আফিসের সময় ট্রামে ভিড়ের অভাব নাই। পথ কখন কল্পনা রাজ্যে চলিয়া গেছে সে নিজেই জানে না। অসংখ্য কাল্পনিক অনুভূতি তাহার দেহমনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পাষাণপুরীর অতীত ইতিহাসের লক্ষ অনির্ব্বাপিত বাসনা তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। মরুসুন্দরীর রূপলেখা তাহার উত্তপ্ত মস্তিস্কে ভাস্বর দীপ্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বনের ভিতর যে ঝড় বহিয়াছিল সে ঝড় দুর্গম দেশ, মরুপ্রান্তর, তুষার পর্ব্বতের উপর দিয়া উন্মাদবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মনের ভিতর প্রলয় বাধাইয়া দিয়াছে। মৃত্যুর কঠিন শীতল স্পর্শে তাহার অঙ্গের শিথিল গ্রন্থি যেন তুলার মত ছড়াইয়া পড়িতেছে—অথচ সেই মৃত্যুর আঁধার আবরণের ভিতর প্রতিক্ষণে রাশি রাশি দীপ্ত সৌন্দর্য্যের কি তৃষ্ণাকায়া মরীচিকা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে!

ট্রাম কখন গন্তব্য স্থান ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভূপেনের সে দিকে খেয়ালই ছিল না। বইখানা বন্ধ করিয়া সম্মুখে তপ্ত রৌদ্রের ধূসর জ্বালার দিকে তাকাইয়া ইরাণ-তুরাণের স্বপ্ন দেখিতেছিল। কণ্ডাক্টার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মশায়, আপনি নাববেন না? টার্মিনাসে এসে পড়েছেন।" প্রশ্ন ভূপেনের কানে গেল না। "আপনি কোথায় যাবেন?" এবারও কোন উত্তর না পাইয়া কণ্ডাক্টার তাহাকে স্বল্প ঠেলিয়া আবার ডাকিল। মায়াপুরী সহসা যেন কুহেলি আবরণে ঢাকা পড়িল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে, শুনিল সে বলিতেছে, "মশাই, হাইকোর্ট এসে পড়েছে, গাড়ী এবার ঘুরবে! আপনি নাববেন কোথায়?" হাইকোর্ট! ভূপেনের মনে পড়িল তাহাকে আফিসে যাইতে হইবে। চমকিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

পা আর চলে না। আর একটু গেলেই ব্যাঙ্কে পৌছান যায়, কিন্তু এ টুকু যেন শেষ হইতে চাহিতেছে না। আফিসে তাহাকে যাইতেই হইবে—আজ মেল্ ডে। কত চিঠি কত হিসাব আজ দূরদেশে যাইবে। মামা বলেন যে, এসিয়ার বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের ব্যাঙ্ক হইতেই সব চেয়ে বেশী চিঠি যায়। ভূপেন একবার ভাবিতে লাগিল—আচ্ছা পারস্যে আরবে চিঠিপত্র বিভাগে কে পাঠায়? বোধ হয় হামিদ। হাসি আসিল,—হামিদ ত দপ্তরী! অকস্মাৎ দুঃসহ ব্যথায় ভূপেনের চক্ষু দুইটি টনটন করিয়া উঠিল—থামিয়া চক্ষু টিপিয়া ধরিতে তাহার মনে হইল যেন সে নেশা করিয়াছে। ছেলেবেলায় একদিন তাহার বাবা (তখনও তিনি একেবারে পাগল হন নাই) জোর করিয়া তাহার মুখে মদ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সে বিষের জ্বালায় দুর্ব্বলস্নায়ু বালকের সর্ব্বদেহ অস্থির প্রদাহে কম্পমান হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ভূপেনের ঠিক সেই রূপ অস্থিরতা বোধ হইতে লাগিল। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গ মনে একটা আচ্ছন্নভাব চলিয়া আসিতেছিল। ভূপেন একবার সবলে ললাট চাপিয়া ধরিয়া এলোমেলো চিন্তাগুলিকে দৃঢ়তার সহিত ঠিক পথে চালাইবার চেষ্টা করিয়া আফিসে ঢুকিয়া পড়িল।

(৩)

আফিসে কাজের চাপে কেহ কাহাকেও দেখিবার অবকাশ পাইতেছিল না। কম্পিত হস্তে হাজিরা বই সই করিবার সময় মামা সতীশবাবু মাথা নীচু রাখিয়াই বলিলেন, "এত দেরী করেছিস কেন? চাকরী রাখা দায় হয়ে উঠবে যে!" ভূপেন কোন উত্তর না দিয়া নিজের আসনে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

খাতা সামনে খোলাই পড়িয়া আছে। রাশি রাশি অঙ্ক মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পাতার উপর দিয়া চলাফেরা করিতেছে। কখন্ যে দশ পাউণ্ড তিন শিলিং-এর একটা

হিসাব তাহার চোখে পড়িয়াছে—তাহার পর হইতে তাহার সমস্ত মনের ভিতর ঐ অঙ্কটা কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছিল; সেটা প্রথমে ছিল একটা শব্দ; তারপর সে যেন তির্য্যগ্‌ দেহে জরির চাপকান পরিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া সমস্ত আফিসের পুঞ্জীভূত গুঞ্জনকে ধাক্কা দিয়া ভূপেনের সম্মুখে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কালীঘাট প্রত্যাগত একটি স্ত্রীলোকপূর্ণ গাড়ী হঙ্‌কঙ্‌ ব্যাঙ্কের সামনে দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ঘোড়াটা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তীব্রবেগে গাড়ীখানাকে ফুটপাথের উপর একটি বৃদ্ধা পানওয়ালীর ঘাড়ে আনিয়া ফেলিল। এক মুহূর্ত্তে সমস্ত রাস্তার ভিতর একটা তীব্র ওলটপালট বাধিয়া গেল। বিপন্নদের আর্ত্তনাদ ও রাজপথের লক্ষ যাত্রীর সন্ত্রস্ত কোলাহল—পার্শ্বস্থ আফিস-বাড়ীগুলিকে কাঁপাইয়া দিল।

বাহিরের এই সহসা উত্থিত কোলাহল ভূপেনের অভিভূত চিত্তকে মুহূর্ত্তে কঠিন আঘাত করিল। তাহার মনে হইল যেন এক অতিকায় কৃষ্ণদেহ দানব আকাশ বাতাসে তীব্র ঘূর্ণী তুলিয়া সম্মুখের দেওয়াল ভাঙিয়া জগদ্দল পাষাণের ভারে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। ভূপেনের নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিতে লাগিল—শুষ্ক ওষ্ঠ একবার কাঁপিয়া উঠিল—ম্লান চক্ষের নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। বদ্ধ মুষ্টিতে দন্তে দন্ত চাপিয়া এই চাপের ভার সরাইতে ভূপেন তাহার চৈতন্যের শেষতম কণাটিকে নিয়োগ করিল। এই চরম প্রয়াসে তাহার দেহের সমস্ত গ্রন্থি কঠিন হইয়া উঠিল, মাথা সম্মুখের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আশে পাশের কর্ম্মভারাবনত লোকেদের কাহারও এ অচৈতন্য লোকটির দিকে নজর পড়িল না।

সাহেব সে দিন একটা হিসাবের জন্য সকাল হইতে সতীশবাবুকে তাড়া দিতেছিল। তাড়াতাড়ি করার দরকার বলিয়া সতীশবাবু আগেকার দিন ঐ হিসাব ভূপেনকে দিয়াছিলেন। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে হিসাব দিবার কথা। পাঁচটার সময় সাহেব সতীশবাবুর কাছে কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইল। তলব পাইয়া সতীশবাবু এক চাপরাশিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভূপেনবাবুর কাছ থেকে কাগজ পত্রগুলো নিয়ে আয় ত।" চাপরাশি ভূপেনের কাছে আসিয়া ডাকিল, "বাবু!" তখন ভূপেনের বোধ হয় চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে—মাথা উঠাইয়া চাপরাশির দিকে ফিরিয়া চাহিল। চোখদুটি লাল—দৃষ্টি মূঢ়। চাপরাশি থতমত ভাবে বলিল, "বড়বাবু ফাইল চাহিতেছেন।" ভূপেন তেমনি ভাবেই চাহিয়া রহিল। চাপরাশি একটু অবস্থার ব্যতিক্রম দেখিলেও ভূপেনের অন্যমনস্ক ভাব অনেক দিনই দেখিয়াছে। সুতরাং সে নিজেই ভূপেনের সামনের কাগজ পত্রে হাত দিয়া বলিল, "এই ফাইল ত বাবু?" ভূপেন কোন উত্তর না দিয়া ফাইল হইতে হাত সরাইয়া লইল। ফাইল দিয়া দিলেন মনে করিয়া চাপরাশি কাগজগুলি সতীশবাবুর কাছে লইয়া গেল।

ফাইল দেখিয়া সতীশবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। হিসাব আধখানা প্রায় বাকি। ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া ভূপেনের কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "এ কিরে? হিসেব তৈরি করিস নি কেন?" ভূপেন চেয়ার হইতে না উঠিয়া তেমনি বিহ্বল ভাবে সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। "হতভাগা, সাহেবকে আমি কি বোঝাব? আজ সারাদিন ধরে করেছিস কি? উত্তর দিচ্ছিস না যে।" বলিয়া ভূপেনের ঘাড় ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিলেন। ভূপেন চমকিয়া বলিল, "অ্যাঁ—!" মুখ বিকৃত করিয়া সতীশবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ—! হিসেব করিস নি কেন? এখন সাহেব যে খেয়ে ফেলবে। যদি না পারবি ত আগে বলিস নি কেন।" বলিতে বলিতে সাহেবের ঘর হইতে সতীশবাবুর তলব আসিল। ভূপেনের উদ্দেশ্যে তীব্র গালাগালি করিতে করিতে সতীশবাবু সাহেবের কামরায় চলিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাহেবের ঘরে ভূপেনের ডাক পড়িল। বাহিরের এ গোলমালের দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই—মাঝে মাঝে শুধু বহির্জ্জগতের রূঢ় প্রতিধ্বনি তাহার অর্দ্ধলুপ্ত চৈতন্যের দ্বারে আঘাত করিয়া তাহাকে বাস্তবজগতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু আচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়বোধ প্রতিবারই সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল। সুতরাং চাপরাশিকে গিয়া বলিতে হইল, "বাবু নেহি আতা।"

সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ড্যাম, কাহে নেই?" প্রমাদ গণিয়া সতীশবাবু নিজেই ভূপেনের কাছে আসিলেন। "হারামজাদা, আসছিস না যে? শীগ্‌গির চল্।" ভূপেন এবার বোধ হয় বুঝিতে পারিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া নিদ্রাচালিত ব্যক্তির ন্যায় সতীশবাবুর পিছনে পিছনে সাহেবের ঘরে চলিল।

বলা বাহুল্য মুহূর্ত্তেই সাহেবের কটূক্তিতে সমস্ত আফিস মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্ব্বোধদের জন্য ব্যাঙ্কের বাজার-সম্মান প্রত্যহ নষ্ট হইয়া যাইতেছে—একথা সাহেব বারে বারে ভূপেনের মনে ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে নিরুত্তর ভূপেনের নির্ব্বোধ দৃষ্টিতে ক্রোধে অধীর হইয়া সাহেব হুকুম দিল, এখনি উহাকে তাড়ান হোক। সতীশবাবু দেখিলেন যে, আর কিছুক্ষণ থাকিলে ভূপেন হয় ত মার খাইবে। তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

'হতভাগা, এমন চাকরিটা নিজের গাফিলিতে খোয়ালি! এখন যা বাড়ীতে কেঁদে মরগে।" ভূপেন এইবার প্রথম অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিল। "নে নে, আর বিড় বিড় করে বকে কি হবে! বাড়ী গিয়ে নভেল পড়্‌গে।" বলিয়া সরোষে নিজের টেবিলের দিকে চলিয়া গেলেন। ভূপেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

তখন শীতের সন্ধ্যার ঘন আবরণে শহর ঢাকা পড়িয়াছে। আজ কুয়াসা যেন কিছু বেশী। বাতাসের হিম শীতল স্পর্শে ধরিত্রীর ধূমায়িত বেদনা যেন জমাট বাঁধিয়া মৃতপুত্রা জননীর মত লুটাইয়া পড়িয়া আছে। মুচ্‌ কালো আকাশে কে যেন এক যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। রাজপথের লক্ষ যান বাহন, চলমান পথিক ও অন্তহীন হর্ম্ম্যশ্রেণী—সমস্ত এক সর্ব্বব্যাপী ধূসরতায় বিদেহী ছায়ার ন্যায় মনে হইতেছে।

মন্থরগতিতে ভূপেন অভ্যস্ত পথে গৃহের দিকে চলিতেছিল। আগেকার আচ্ছন্ন ভাবটা এখন যেন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। মনের ভিতর এলোমেলো চিন্তাগুলি আর তাহাকে কষ্ট দিতেছে না। আজকার সমস্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাকরি গিয়াছে। একথা শুনিলে আশা বিষণ্ণ হইবে। তবে তাহাকে বুঝান কঠিন নয়। আর বুঝানই বা বলি কেন? সে ত চাকরিই পাইবে। কিসের চাকরি? কেন, তুলার। বোম্বাই-এর বাজার তুলার, আর কলিকাতার বাজার পাটের। তাহাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাজ করে এমন একজন বোম্বাইওয়ালা তাহাকে এ কথা বলিয়াছে। সে লোকটা মুসলমান। দাঙ্গা করিবে। নাঃ—উহারা বোরা মুসলমান, দাঙ্গা করে না। ভাল ভাল মুসলমানেরা কে আর দাঙ্গা করে? এই ত সাজাহান যখন সম্রাট ছিলেন তখন কত আমীর ওমরাহ্ বাদশার মতিমহলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত। মতি মহলটা অনেকটা রাজেন মল্লিকের বাড়ীর মত। আরে—রাম! রাজেন মল্লিক বিলাসসজ্জার কি আর জানিত? সে ত আর হায়দ্রাবাদ যায় নাই? এই হায়দ্রাবাদেই তাহার চাকরিতে আজ যাইতে হইবে—কতদূর—! প্রথমে বৌবাজার, তারপর টিপুসুলতানের বাড়ী, মৌলালী আর মোল্লার চক পার হইলে তবে হায়দ্রাবাদ!

* * *

পথের আর শেষ নাই। এ পথে ভূপেন কখন আসে নাই। দুই ধারে বাড়ীগুলার রং প্রায়ই শাদা। ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে ভিতরের রঙ বেরঙের কারুকার্য্য দেখা যায়। এক তন্বী একটি জানালায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দীর্ঘ সর্পিল বেণী সূক্ষ্ম পীত ওর্ণার ভিতর দেখা যাইতেছে। দুধারে দোকান পাট প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। একটা দোকানে এক দীর্ঘবপু শুভ্রবেশ মোগল তাহার ভৃত্যকে কি বলিতেছে। বোরকা-পরা একটি মহিলা আগে আগে যাইতে যাইতে একটি দ্বিতল বাটীতে ঢুকিয়া পড়িলেন। সে বাড়ীর দরজা খোলা—ভিতরে ঘরের কোণায় এক বৃদ্ধ নমাজ পড়িতেছে—আর একটা ছবির পাশে দাঁড়াইয়া এক আয়ত চক্ষু উন্নত ললাট সুন্দর দেহ যুবা তায়

একজন প্রৌঢ়কে ছবিটি বুঝাইয়া দিতেছে। এটি মোগল বাদশার শীকারের ছবি—ঐ যুবকই আঁকিয়াছে।

এ শহর যেন গোলক ধাঁধাঁর মত। পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বাড়ীগুলির এদিক ওদিক দিয়া কোথায় যে মিশাইয়া আছে তাহা বুঝাই যায় না। ম্লান আলোকে কৃষ্ণ প্রস্তরমণ্ডিত পথের দিকে তাকাইলে হঠাৎ মনে হয় যেন এক অতিকায় সরীসৃপ। এক জায়গায় দুধারে বাড়ীগুলি কমিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। এই দিকে শহরের উপকণ্ঠ। দূরে একটা শব্দ শোনা যাইতেছে —রেলের ইঞ্জিনের মত শব্দ। ঐ খানে বোধ হয় কারাগার। সেখানে হাজার হাজার কয়েদী অহোরাত্র কাজ করিতেছে। প্রহরীরা তীব্র কশাঘাতে তাহাদের শিথিল অঙ্গকে সজাগ রাখিয়া ঘানী চালাইয়া লইতেছে।

বাড়ীগুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে। অস্পষ্ট আবছায়ার মত সামনে একটা বৃহৎ প্রান্তরের খোলা বুকের আভাস পাওয়া যায়। ঐ প্রান্তরের দক্ষিণে বনানীতে ঝড় উঠিলে বড় ভয় করে! কেন না সে ঝড় দেহী। তাহার এলো চুলে আকাশ ঢাকিয়া যায়—কালো চোখের ভীষণ ভ্রুকুটিতে নদীর বুক কাঁপিয়া উঠে। ভূপেন একবার এই উন্মাদিনী দানবীকে দেখিয়াছে,—কবে কোথায়, তাহা মনে নাই।

প্রান্তরের পথটি সরু—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ হাসির বিভীষিকার মত। এই পথের শেষে তাহাকে পৌঁছিতে হইবে। রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছে। চারিদিককার কুয়াসা কাটিয়া গিয়া গাঢ় সুশীতল অন্ধকার ভূপৃষ্ঠকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে। অদূরে ক্ষীণ কলধ্বনি শুনা গেল। এ ত নদীর ধার। বাঁ দিকে যাইতে হইবে। সে বাঁ দিকে ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ভূপেন খানিকটা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ আশে পাশে নজর পড়াতে দেখিল, অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দেখা যায় প্রান্তরের মধ্যে অসংখ্য অজানা বস্তুর স্তূপ উঁচু হইয়া সারি সারি রহিয়াছে।—ঈদের দিনে সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে নমাজ পড়ার সময় ভূলুণ্ঠিত অযুত মানবদেহ যেমন ভাবে দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। ভূপেন থমকিয়া দাঁড়াইল। স্তূপগুলি অনেকটা শাদা শাদা রঙ—তালপাকানো দলা দলা অন্ধকারকে কে যেন ঘসিয়া ঘসিয়া পরপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। কাছে আসিয়া লক্ষ্য করিতেই ভূপেন দেখিল যে, সে স্তূপ আর কিছু নয়—কবরের উপরকার সমাধি প্রস্তর—সমস্ত মাঠ এই কবরে ভরিয়া রহিয়াছে। ভূপেনের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ছেলেবেলায় তাহার সার্কুলার রোডে আর্ম্মেনি কবরখানার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে খুব ভাল লাগিত। একবার সে রক্ষীর সহিত আলাপ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন দিনের আলো রহিয়াছে। কিন্তু ভিতরে অল্প সময় থাকিতেই হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছিল, অসংখ্য গম্বুজের শৈবাল-মলিন প্রস্তর ঠেলিয়া ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য মৃত আত্মারা প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছে, যে কোন মূহূর্ত্তে পাষাণ বন্ধন খুলিয়া বাহির হইয়া তাহারা প্রাণীজগৎকে দলিয়া মথিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে।

সেই দিন হইতে সে কখনও কবরখানার কাছেও যাইত না। বাড়ীর কাছের একটিকে এড়াইবার জন্য প্রতিদিন অনেক রাস্তা ঘুরিয়া যাইত। এই নির্জ্জন প্রান্তরে সমাধি স্তূপের সারি দেখিতেই তাহার মন সেই আবাল্য সঞ্চিত ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। এ সমাধিশ্রেণীর আর যেন শেষ নাই। আর তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতর মরণ কালো অন্ধকারের ভয়াবহ নাট্য চলিতেছে। পাথরের তলায় গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে—গুমরান আওয়াজ যেন কালো কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অবনত মস্তকে অসংখ্য ছাত্র গোঙাইয়া গোঙাইয়া ফার্সী বয়েৎ আওড়াইতেছে। অন্ধ ত্রাসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভূপেন দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

দূরে একটা গেটওয়ালা দেওয়াল দেখা যায়। ভূপেনের মনে একটু আশা হইল। ও দেওয়াল পার হইলেই রক্ষা পাওয়া যাইবে। সে গেটের কাছে আসিয়া ভাঙা দরজা পার হইয়া দেখে ওধারে একটা পুরাণ পরিত্যক্ত বাড়ী রহিয়াছে। এ বাড়ী যেন তাহার চেনা মনে হইতেছে। বাড়ীটার ওধারে আর একখানা ছোট বাড়ী। কার বাড়ী? ভূপেনের ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

কি মনে করিয়া ভূপেন বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারশীর্ষে একটি শুষ্ক আম্রপল্লব ঝুলিতেছে। আমীরদের ছেলেদের কি অন্নপ্রাশন হয়? ভূপেন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। সম্মুখেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ধরিয়া ভূপেন উপরে উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটা কিসের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। উপরে দরবার হইবে। দূরে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসিল। এখানেও?

দোতলার সিঁড়ির সামনে ঘর, আলো নাই--তবে কোন দূরস্থ আলোর পথ এইখানেই শেষ হইয়াছে। ভিতরে ঢুকিয়া ভূপেন একখানা চেয়ার দেখিতে পাইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। এটা তাহারই জন্য খালি রহিয়াছে। মামা আর হামিদ এ কথা তাহাকে বারবার বলিয়া দিয়াছে— মুসলমানের কাছে আদবকায়দা না জানিলে চলাফেরাই করা যায় না। বিশেষতঃ এই তুলার চাকরিতে তাহাকে অনেক পুরসুন্দরীর সঙ্গে মেলামেশা করিতে হইবে। হঠাৎ ভূপেনের চারিধারে নজর পড়িল। ঘরটা অনেক বড় মনে হইতেছে। মেজের উপর রঙীন কি যেন রহিয়াছে। গালিচা। অনেক ফুলের খুশবায় আসিতেছে। ফুল নয়,—নবাবী আতর। অন্ধকারে চক্ষু অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। ঘরের একধারে সারি সারি চেয়ারে অনেক লোক চুপ করিয়া বসিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। ভূপেনের অসাচ্ছন্দ্য বোধ হইতে লাগিল। দরবারে কি আর কেউ আসে না? ইহারা অমন হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে কেন? দাঙ্গার সময় হইলে মিস্তিরদের বন্দুকটা চাহিয়া আনিয়া সে ইহাদের ঠিক করিয়া দিত।

দ্বারের কাছে শব্দ হইল। কাহারা ঘরে ঢুকিতেছে। ভূপেন তাকাইয়া দেখিল যে, নবাব আসিতেছেন। একটু রোগা, চোখ দেখিলে খুব রাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। মুখটা অনেকটা বাবার মত। বাবা যদি নবাব হইতেন! নবাবের পিছনে কে যেন আলো হাতে দাঁড়াইয়া। কি সুন্দর এ তরুণী। আশার সমস্ত লাবণ্য যেন তাহার দেহের জড় বন্ধন ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। ভূপেন মনে মনে ঠিক করিল, অনেক বুঝাইয়া এ তরুণীটিকে সে নিরস্ত করিবে। বিবাহিত লোকের আর বিবাহ করা উচিত নয়।

আলোটি নিকটে রাখিয়া তরুণীটি কাছে আসিল। অমনি নবাব তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি এখানে কেন?" তরুণী ভূপেনের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি না হইলে ইহাকে দেখিবে কে?" ভূপেন অস্থির হইয়া উঠিল। বিবাহ সে করিবে না। ইহারা মানুষ খুন করে। দূরে দ্বারের কাছে ছায়ার মত কি দাঁড়াইয়া আছে—ওই ত হাব্‌সী খোজা প্রহরী। ভয়ে ভূপেনের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ ঘরের কোণায় একটা ছোট ছেলের কান্নার আওয়াজ শুনা গেল। তরুণী ত্রস্ত পদে সেই দিকে চলিল। নবাব ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "এর মধ্যে ছোট ছেলে কেন? মেরে ফেল—মেরে ফেল।" বলিতে বলিতে ভূপেনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যাও, যাও ওধারে যাও।—নইলে ও সহজে ছাড়বে না।" ভূপেনের শরীরের রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। এরা এমন কেন? দৃঢ় পদক্ষেপে সে তরুণীটি যেখানে একটি শায়িত শিশুর পাশে গিয়া বসিয়াছে—সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। শুনিল তরুণীটি বলিতেছে, "সব পাগল। নইলে আমার মত বেঁচে মরে থাকতে হয় কটা লোকের?" নবাব কর্কশ কণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। মরা; মরা বই কি? জ্যান্ত লোকের কি আর মরার সঙ্গে বিয়ে হয়?" মরা! ভূপেনের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল! কখন্ অজ্ঞাতসারে কবরদ্বার খুলিয়া এ চলিয়া আসিয়াছে। তরুণীটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূপেন চাহিয়া দেখিল তাহার চোখের কালো তারার পিছনে অনেক রহস্য লুকান রহিয়াছে। মায়াবিনী মৃত্যুর নিকট তাহার মায়াগুলিকে ভীষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। এর যত মায়া ঐ চোখে। চোখ দুটি ক্রমেই বড় হইতেছে। দীর্ঘ পক্ষরাজির গণ্ডী ছাড়াইয়া ক্রমেই তাহার পরিসর অন্ধকারে মিশাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। এ কী সর্ব্বগ্রাসী বীভৎস চোখ! আদি নাই, অন্ত নাই, কান্না নাই, ছায়া নাই— লোলুপ ক্ষুধায় এ চোখের অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। সে ক্ষুধা ভূপেনকে ঘিরিয়া একটা নিষ্ঠুর চাপা হাসির শব্দে

তাহার চারিধারে মরণ খেলা খেলিতেছে—এখনি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভূপেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার চরম চেষ্টায় সে উন্মাদবেগে ঐ অস্পষ্টদেহী নারীকে ধরিয়া ফেলিল। কে যেন কোমল হস্তে তাহার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ছাড়াইতে দিলেই সর্ব্বনাশ! মত্তহস্তীর বলে ভূপেন তাহাকে টিপিয়া ধরিল।

* * *

সকালবেলা গোয়ালকে ডাকাডাকি করিতে দেখিয়া ঠিকা-ঝি উপরে বৌমাকে খবর দিতে আসিল। দোতলার ঘরে আসিয়া দেখিল দরজা খোলা। বাবু রোজ সকালে বাহির হইয়া যান। ধীরে ধীরে দ্বারের নিকটে আসিয়া 'বৌমা' বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেই ঘরের ভিতরটা তাহার চোখে পড়িল—এবং 'বাবাগো' বলিয়া সভয় আর্ত্তনাদে পিছাইয়া আসিল। ঘরের মেজেতে আশার প্রাণহীণ দেহের কাছে বসিয়া ভূপেন নিস্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে। নিদ্রিত শিশুটির কাছে দাঁড়াইয়া ভূপেনের পিতা অস্ফুট হাসি হাসিতেছে।

মাধুকরী

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

প্রভাত, তোমার অরুণ-রঙীন বেশে
অনেক আলোর অনেক ঝালর হাসি,
আমার সোনার-স্বপন বোনার দেশে
খানিক হাসির মাণিক ছড়াও আসি'।
অনেক হাসির অপার অপব্যয়ে
হাসির নীচের কাঁদন পড়ে ধরা,
তোমার মুখের খানিক খুসীর ভায়ে
হাসাও আমার নয়ন বাদল্-ভরা।

নিশীথ, তোমার নিবিড় কেশের ফাঁকে
হাজার তারার হীরার ধারার রেখা,
ওদের কাঁপন আমার নয়ন ডাকে,
ওদের ও রূপ আমার হিয়ায় লেখা।
নিশীথ, তোমার তারার নয়ন হ'তে
খানিক স্বপন আমায় দিতে পারো?
অনেক রাতের জাগর ব্যথার স্রোতে
দোলায় এমন স্বপন যে চাই আরো।

বেদে

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বনজ্যোৎস্না

বিনোদের আর যাই থাক্, একখানা গলা ছিল। যেমন জোরালো তেম্‌নি খোনা। তিন রকম আওয়াজ বেরুত,—হেঁড়ে, হাপুরে আর খন্‌খনে।

কিন্তু খুব সকাল বেলা,—অন্ধকার তখনো ডুবে উবে যায় না,—যখন বালিশের থেকে মুখ বার করে' বলে' ওঠে—সাত ভাই চম্পা জাগ রে,—

আর যখন ঘুমন্ত কারুরই কোন সাড়া না পেয়ে হঠাৎ গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে ধীরে উচ্চারণ করে—কেন বোন পারুল ডাক রে,—

মনে হ'য় অপরূপ, অপরিচিত সে কণ্ঠস্বর।

শুনি, আর মনে হয়, যেন ভোরের তারা যাবার আগে ভোরের আলোর কানে কানে কি কথা কয়ে যাচ্ছে।

রোজ।

খুব মনে পড়ে সেদিনটা। বিকাশের পিছু পিছু যে লোকটা মাথা খাড়া করে' আস্‌তে গিয়ে চিপা দরজার চৌকাঠে বিরাট একটা ঢুঁ খেয়ে টু-টি না করে' বেকুবের মতো ঘরে এসে ঢুক্‌ল,—সেদিন তার অনেক কিছু দেখেই আশ্চর্য্য হওয়া যেত হয়ত,—কিন্তু আমি দেখেছিলুম তার নাকের ওপর ত্রিশূলের মতো কাটার দাগ একটা,—আর তার দু'পাশে দুই চোখের আর্দ্র ও অবসন্ন বিষণ্ণতা।

অখিলবাবু গাড়ুতে সবে জল ভরেছিলেন,—সন্ন্যাসী দেখেই সেই জলে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি কচ্‌লে নিয়ে ছুটে এসে বল্লেন—পেন্নাম সন্নেসী ঠাকুর। কি মনে ক'রে এই গরীবদের আস্তানায়?

বিকাশ বল্লে—আস্তাবলে বলুন, অখিলদা।

অখিলবাবু যদ্দূর পারেন ঠোঁট দুটো প্রাণপণে টেনে দাঁত বত্রিশটা দেখিয়ে বল্লেন—হঠাৎ পায়ের ধুলো পড়ল?—

বিকাশ বল্লে—আপনাদের আপিসে যদি একে একটা কোন ভাঁওতা ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারেন তো বেচারার একটা হিল্লে হয়। একটা নাপিত ডাকি বিনোদ, দাড়ি-গুলি কামা'।

অখিলবাবু কথায় কোন কান না পেতেই যেতে যেতে বল্লেন—আমি এখুনি আস্‌ছি, ঠাকুর। গরীবের হাতটা একবার দেখে দিতে হবে।

বল্লাম—কোথা পেলি বাবাজীকে?

—এক মন্দ ফিকির করেনি ভাই,—বিকাশ বল্লে—মাস দুয়েক কষ্ট স'য়ে চুল আর দাড়িগুলি দিব্যি গজিয়ে ফেলেছে,

—ব্যবসা ফ্যালাও-এর দিব্যি ক্যাপিটাল। তুই ত পুরো ছটা মাস পা-টম্‌টমে টো টো ক'রেও কোনো আপিসে একটা ঠোকর পর্য্যন্ত মার্‌তে পার্‌লি না। ও বেড়ে এক গোছা দাড়ি বাগিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে সুরু করলে। ভিক্ষাও না, বক্তৃতাও না,—একটা ইংরিজি কবিতার আবৃত্তি। নারকেলহীন নারকেলডাঙার গোবর গণেশরা এই নাগা সন্নেসীর অদ্ভুত প্যাঁচে একেবারে বে-কায়দা হয়ে পড়েছে দেখলাম। ভিড় সরিয়ে দেখি,—আরে বিন্‌দা না?

—চিন্‌তে পার্‌লি?

—ঐ আধখানা কানটা দেখেই চিনে ফেল্লাম। ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে রামপ্যারী মাষ্টারের মুখ দিয়ে নাল্ গড়াত। তাই দেখে আমি আর বিন্‌দা জোট্ বেঁধে বেঞ্চির তলা দিয়ে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়েই বলে ফেলেছিলাম—ও বুড়ো, হুতুম্-খুড়ো, লবেনচুষ খাবি? হাব্‌লা বুড়ো ত' চ'টে মটে একাক্কার হয়ে সাম্‌নের ছমু মুদির দোকান থেকে দুটো তালপাতার বড় বড় ঠোঙা নিয়ে এসে গাধার টুপি বানিয়ে আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিলে। মাথা দুটো দোহাত্তা ঠুকে দিয়ে দুটো টুলে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে—কান মল্ দু'জনে দু'জনেরটা।—জোর্‌সে! পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে কী কান মলা ভাই,—কাছি-টানাটানি। বিন্‌দার ছিল বেরালের মতো নোখ্, রক্ত বার করে' ছাড়লে। আমি একেবারে খেপে গিয়ে খপাস্ করে ওর কানে কামড় বসিয়ে দিলুম,—আধখানা মুখের মধ্যে বেমালুম চলে' এল। তাইতেই। এখন ঐ কাটা কানটা মনে হচ্ছে যেন নেংটি ইঁদুরের ছা।

বিনোদ খোনা গলায় বল্লে—খিদের খোরাকের জন্যই এই ফিকির নয়, ভাই। যেমন গৌতম—

জিভ্ উল্টে বিকাশ বল্লে—থাক্! গৌতম নয়,—গো-তম,—গরুশ্রেষ্ঠ।

বল্লাম—ঐ অখিলবাবু এসে পড়্‌ছেন—

বিকাশ বল্লে আস্তে আস্তে—হাত পাত্‌লেই এক নিঃশ্বাসে বলে' যাবি বিন্‌দা,—তৃতীয়পক্ষ আপনার,—আগে নাম ছিল গজেন্দ্রবালা, বদলে রেখেছেন গজমোতি—প্রথমপক্ষে সাতটি, দ্বিতীয় কোঠায় চারটি আর তিন নম্বরে আধখানা।

—তার মানে?

—তার মানে যমজ হয়েছিল, একটি পটল তুলেছে। বলিস্, আপনিই পাশ ফিরতে গিয়ে ভুঁড়ির তলায় ফেলে চেপ্‌টে দিয়েছিলেন।

—আর?

—বলিস্, আপনি সাড়ে চৌত্রিশ টাকায় পাটের গুদামে পাটের বস্তা গুণে দিন কাটান,—পান খাকি সিগারেট, শোন্ গামছা প'রে,—দু'মাস বাদে আপনার আট আনা মাইনে বাড়বে। ভুঁড়িটি ভোম্বল হ'লেও ভোগেন অম্বলে, সে দিন বিকাশের পাল্লায় বায়স্কোপে গিয়ে শেষ হবার জায়গায় সিটি মেরেছিলেন, রবিবার সকালবেলা ঘুষি মারলেও আপনার ঘুম ভাঙে না,—কেরাণীর ঘুম।

বল্‌তে বল্‌তে বিনোদ বেফাঁস ব'লে ফেল্লে—আপনার তৃতীয় পক্ষটিও টিক্‌লে হয়!

—বলেন কি মশাই?

অখিলবাবু কিল খেয়ে আঁৎকে উঠলেন যেন।

সাম্‌লে নিয়ে বিনোদ বল্লে—তবে চতুর্থ পক্ষ আপনার বাঁধা একেবারে। চেলি প'রে জল্‌জল্ কর্‌ছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে বল্লেন অখিলবাবু—যাক্, দমটা ফিরে পেলুম। কোন বিঘ্ন হবে না ত' বাবাজী?

—কিঞ্চিৎ। তা, টাক্ আপনার বেশ টন্‌কো আছে।

বল্লাম—তা হ'লে এখন থেকেই জীইয়ে তোয়াজে রাখুন অখিলবাবু।

বিকাশ বল্লে—আমার জিম্মাতেও রাখতে পারেন—

বিনোদ গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। আমাদের পুরোনো হোঁচট্-খাওয়া মুখ-থুব্‌ড়ে-পড়া মেস্‌টা যেন হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠল।—যেন মিতা মিলেছে।

এতদিন কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। একটা পা

যেন ছিল না,—যেন ফিক্ দিয়ে ছিল এতদিন,—সহসা সব জমাট হয়ে উঠেছে। কবিতার চমৎকার মিল একটা।

একটা জীর্ণ থুথ্‌রো বুড়ো বাড়ীর সঙ্গে যে একটা জ্যান্ত মানুষের এমন সামঞ্জস্য থাকতে পারে, ভাবিনি। যে ছেঁড়া আলখাল্লাটা ও ছেড়ে ছুঁড়ে ফেললে তার রং এককালে গেরুয়া ছিল, এখন তা ম'রে ম'রে মেটে কাদাটে হয়ে এসেছে—সেই আলখাল্লাটার সঙ্গে পর্য্যন্ত।

বুকের একটা দিক একেবারে চাপা, বসা, যেন একটা ফুস্‌ফুস্ কে চুষে নিয়েছে। নাকটা থেঁৎলান, কানের আধখানা খোয়া গেছে, গলাটা হাড়গিলের মতো, মাথায় বাবুই পাখী বাসা বেঁধেছে বুঝি।

কিন্তু এই কুৎসিত হতচ্ছাড়া দেহটার আবরণ উন্মোচন করার নির্লজ্জতার মধ্যে যেন সুদূর একটি ব্যথা আছে।

শ্যাওলা-পড়া দেয়াল ফুঁড়ে বটের চারা বেরিয়েছে,—ওরা ওকে সম্ভাষণ জানায়। ফাটা ইঁটগুলি ওর ভাঙা পাঁজরার পানে চেয়ে থাকে।

দাঁত-বের-করা রাস্তা,—পায়ে খোয়া শুধু ফোটে না, কামড়ায়। মনে হয় ওর মেজাজ যেন সব সময়ই খিট্‌খিটে। রোগাপট্‌কা গলি,—কেশে কেশে যেন ধুঁকছে,—এমনি মনে হয়।—তালপাতার সেপাই।

পাশেই বুড়ো বাড়ীটা জুজুবুড়ীর মতো ঘুপ্‌টি মেরে ব'সে,—যেন ফোক্‌লা দাঁতে হাস্‌ছে।

বাড়ী আর রাস্তা,—দুই ভাইবোন যেন। সমবয়সী। শীতের হাওয়ায় জবুথবু হয়ে ব'সে আপন মনে খোসগল্প করে।

নীচের তলায় এক খোপ্‌রিতে কিনু উড়ে বাদামী তেলে ফুলুরি ভাজে, কপাল বেয়ে টস্‌টস্ ক'রে ঘাম ঝরে কড়ার ওপর,—আরেকটাতে রাখহরিরা আগুনে টিন তাতিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় সারাদিন,—তৃতীয়টায় এক বুড়ো কব্‌রেজ—দিন প্রায় কাবার করে' এনেছে—মাটির ওপর ময়লা চাদর বিছিয়ে শুয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে, বার্দ্ধক্য ওকে শুষে শুষে একেবারে আম্‌সি করে ফেলেছে। রাস্তার যে লোক ভুল ক'রে এই কাঁকড়ার মতো বুড়োর পানে একবার তাকায়, তাকেই ও ডাকে,—বলে—কেন শুধু শুধু পিত্তশূলে ভুগছ সোনার চাঁদ, সাড়ে চার আনার পয়সা দিয়ে এক হপ্তার বড়ি নিয়ে যাও, অনুপান শুধু দুটো গেঁদেল পাতা।

এই বুড়োর মুখে যেন এই বোবা বন্দী ব্যাজার গলিটার কাতর কাকুতি!

সব শেষের ফোকরটায় শালু ধোপার আখ্‌ড়া। ছেলেটা আখ চিবোয় আর কাপড় থেকে চোরকাঁটা বাছে, ধোপা তক্তপোষের ওপর কাপড় টান্ ক'রে ফেলে ইস্ত্রি চালায়—ম্যালেরিয়ায় আর মদে দেহ ত' নয় চুলোর চেলা-কাঠ; আর ওর বউ দাওয়ায় বটি ফেলে ছাই মেখে মরা পুঁটি কাটে পিত্তি গেলে' গেলে'—আর রাস্তায় চেনা লোক দেখলে কুটনো থামিয়ে হেসে হেসে দুটো সস্তা, ঠুন্‌কো ঠাট্টা করে নেয়। দরজার সাম্‌নে একটা গাধা বাঁধা।

ভোরের রৌদ্রে এই সংসারনির্ব্বাহটি ভারি মধুর মনে হয়।

সে দিন শালুর ঘরে একটা তুমুল তোলপাড়ে আমরা সবাই উদ্ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম।—অখিলবাবু তাঁর হাতের হুঁকোটা উল্টো ক'রে ভীমের গদার মতো বাগিয়ে ধ'রে। শালু আর ওর বউ দুজনে দুজনের চুলের ঝুঁটি ধরে' ঝাঁকছে, চেঁচাচ্ছে,—আর এমন মুখ খিস্তি করছে যে, দস্তুর মত লজ্জার থেকে ভয় বেশী হয়। গায়ের লোম থেকে দেয়ালের পিঁপড়েগুলি পর্য্যন্ত শিউরায়। যে যা হাতের কাছে পাচ্ছে,—থালা ঘটি ঝাঁটা নোড়া বদ্‌না বটি—তাই ছুঁড়ে মারছে,—যেন রাক্ষসে-বানরে। হ্যাব্‌লা ছেলেটা তাই উল্লাসে হাততালি দিচ্ছে আর লুটোপুটি খাচ্ছে। আর সমজদার গাধাটার সে কী তারিফ!

আজ দেখি—আজকে হঠাৎ ইল্‌শেগুঁড়ি খইয়ের গুঁড়োর মত ঝ'রে পড়ছে—দাওয়ায় শালু আর শালুর বউ পাশাপাশি পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে,—শালুর বউয়ের কোলের ওপর একটা ছোট গাম্‌লাতে কতগুলো মুড়ি, তাই দুজনে চিবুচ্ছে। কথা কইছে না, শুধু কাঁধের সঙ্গে কাঁধটা ঠেকিয়ে রেখেছে! ওদের পা ছড়িয়ে বসা

থেকে সুরু ক'রে হেলান দেওয়াটি পর্য্যন্ত মধুর আলস্যে ভরা।—পাৎলা ঘুমের মতন।

পকেটে দশটা পয়সা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম,—ছেলে-পড়ানো থেকে বাজার করা তক এমনি একজন বেকার চেয়েছে। আফিস-খাম আর টিকিট কিনতে হবে। আর, জামা কাপড়ের এমন ছিরি হয়েছে যে, একটা মেটে সাবান না হ'লেই নয়, জামার বোতামগুলো ছেঁড়া, কিছু আলপিনেরও দরকার।—মনে মনে দশ পয়সার হিসেব কষি।

গ্যাসপোষ্টে, এখানে সেখানে তাকিয়ে তাকিয়ে চলি, যদি একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যদিও কালে ভদ্রে দু' একটা পড়ে—তার আর ঠিকানা খুঁজে পাই না, কে আগে-ভাগেই লুফে নিয়েছে। লট্‌পটে চটিজুটো টেনে টেনে পথ ভাঙি। একটা বড় বাড়ীর দরজার সামনে ভোর বেলাই অজস্র লোকের ভিড়। জিজ্ঞেস করি—ব্যাপার কি এখানে?

একজন বলে—সকালের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে যে, জুতোর দোকানের এক বিক্রিদার চাই। চৌদ্দ ঘণ্টা ফাটক—চৌদ্দ টাকা মাইনে। ভিড় জুটেছে প্রায় চুয়াল্লিশ। বাবু এখনো নামেনি বলে' দরোয়ান দরজা খুলছে না। দেখছেন কি রকম ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে!

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটা করুণ করে' একটু হাসে,—হাতের কাগজটা মোচড়ায়,—অথচ ফিরে যায় না।

চলি। মোড়ের মুচিটা ছেঁড়া হাঁ-করা চটিজুতোর পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—মাছের ওপর বেরালের দৃষ্টির মতন;—গাড়ির আড্ডার গাড়োয়ান ডেকে জিগ্‌গেস করে—কোথায় যেতে হবে?—ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে' নতুন নবডঙ্গ ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে ভাবে—আমাকে দিয়েই বুঝি ওর বউনি হবে আজ,—যদি নাড়ীটা দয়া করে' ওকে দেখাই!—বেশ একটু সচেতন হয়ে ওঠে। ভিখারী ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা না দিলেও আশীর্ব্বাদ করে—মাগ্‌না।

গঙ্গা বলে' ডাকতে দুঃখ হয়,—একটা বড় নর্দ্দমা! পায়ে অতিকায় কারখানা একটা—যেন হিক্কা উঠেছে। ফুস্‌ফুস্‌টা এই ফাটল বলে'।—সপাসপ্‌ ঢুকে গেলাম; বল্লাম—সাহেবের ঘর কোন্‌টা?

শিরদাঁড়াটা খাড়া করে' সাহেবের ঘরে ঢুকে সেলাম না ঠুকেই বল্লাম—একটা চাকরি দাও'

গুণপনা কি, জিগ্‌গেস করায় বল্লাম যে, চৌকো একটা লেফাফায় চওড়া একটা কাগজ, আর এই চওড়া বুকটা।

বি, এ, পাশ-কে কলের কুলিগিরিতে বহাল করতে পারে না—সাহেব বল্লে।

বল্লাম—ড্যাম। দেখ এই ড্যানাটা। জামার হাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে মজবুত বাহুটা ওকে দেখাই।

কিছুই হয় না। সাহেব দরজা দেখিয়ে দেয়। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পেটুক কারখানাটা দেখি,—বেশ লাগে। ওর কবিতায় নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ছন্দ মেলাতে ইচ্ছা করে।

দুটো লোক করাত দিয়ে একটা লোহার 'বিম্‌' কাট্‌ছে। বলি—কতক্ষণে ফুরোবে?

—ঘণ্টা আষ্টেক ত' বটেই,—সেই কখন্‌ থেকে বসেছি। ড্যানা দুটো ছিঁড়বে এবার।

আবার গঙ্গার পার বেয়ে হাঁটি। ওর টুঁটি সহস্র মুঠিতে কারা টিপে ধরেছে,—বাতাসের জন্য হাঁপানি-রোগীর মতো গলা বাড়িয়ে রয়েছে যেন। ঐ দুটো অসহায় মজুরের কথা ভাবি,—আর কতক্ষণ করাত চালাবে ওরা!

ছবির নীচে লেখা তিলোত্তমা,—বাজাচ্ছে না কেন ডুগি-তবলা,—দেবী ত' বটেন। অখিলবাবু তাই যত্ন করে'

মাথার পাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। বিকাশের ঘর থেকে আধপোড়া সিগারেটের টুকরোগুলি কুড়িয়ে এনে পিন্ ফুটিয়ে ফুটিয়ে খান্,—খুকী-বউয়ের জন্য স্প্রিং-এর নাগরদোলা থেকে সুরু করে' মৃগীরোগের ওষুধ কেনেন লুকিয়ে লুকিয়ে। আগে আগে গাড়োয়ানি ইয়ার্কিতে ভরা এক পয়সার চোথা কাগজ কিনে সপ্তাহ ভরে' তাই তুইয়ে তুইয়ে পড়তেন। এগুলো দিয়ে ঠোঙা হবে না, দাম এর আধলার আধপয়সা বেশী নয়,—কাগজওলা এই কথা বলাতে আর কাগজ কেনেন না। এতদিন ধরে' যা পুঁজি করে' রেখেছিলেন, পুঁটলি বেঁধে বাড়ী নিয়ে গেলেন একসময়, শেষ আধখানা বাচ্চাটার দুধ গরম হবে।

এখন আপিস থেকে এসে ভিজা গামছা বুকের ওপর ফেলে ছাতের ধারে বিনোদের মুখে দেশ-বিদেশের গল্প শোনেন।

তাই জান্তাম।

সে দিন বিকাশ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—গল্প শুনে যা কাঞ্চন,—বিনোদ-বাবাজীর আসনাইর কেচ্ছা।

এক পাশে শুয়ে পড়লাম। বিকাশ বল্লে—আপনার ভুঁড়িটি একটু এগিয়ে দিন্ অখিলদা, তাকিয়া করি। তাকিয়ায় ঠেস না দিয়ে কি প্রেমের গল্প শোনা যায়, না সহ্য হয়?

একদিকে বিকাশের হাসি, যেমন প্রচণ্ড, তেম্নি নিষ্ঠুর। তবুও, অন্যদিকে বিনোদের সেই উদাসীন উচাটন কণ্ঠস্বর,—হোক্না হেঁড়ে, হোক্না স্যাঁৎসেতে, কিন্তু করুণ, মন্থর,—যেন সমস্ত ঠাট্টাকেই উপেক্ষা কর্ছে।

বিকাশ বলবে, অখিলদা ঝিমুচ্ছেন,—কিন্তু এ তাঁর তন্ময়তা, যেমন তন্ময়তা এই ধ্বসে-পড়া অন্ধকার নিসাড় বাড়ীটার।

বিনোদ একমনে নিজের দাড়ি হাতায়, আর কোনো কুণ্ঠা না করেই বলে চলে খোনা গলায় অথচ আস্তে—সে কী রোদ ভাই,—চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। বড় ইষ্টিশান থেকে আট ক্রোশ দূরে আমার সেই পারুল-ফোটার গাঁ,—চলি চলি আর তার সজল সস্নেহ চোখ দুটি ভাবি,—আর দুপুরের রোদ যেন জুড়িয়ে আসে। সমস্ত দেহ অবশ—অথচ ক্লান্তির মধ্যে এমন একটা শান্তি। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, সন্ধ্যা ডানা মেল্ছে—তখন পৌছুলুম।

বিকাশ বল্লে—তার পর ত' ঘরে ঢোকা মাত্রই পারুলের 'পারীয়া'-বাপ ঠ্যাঙা উঁচিয়ে তেড়ে এসে তোকে তাড়িয়ে দিলেন,—তুই উল্টে একটা চড়ও মারতে পার্লি না, না? কি কর্লি তখন?

—প্রকাণ্ড অশ্বত্থের তলায় পারুল আমারই জন্য ছায়া মেলে রেখেছে। দেখা কি এত সহজেই মেলে? আমারই জন্য পারুল পাঠিয়ে দিলে বাতাসের স্নেহস্পর্শ,—আমারই জন্য জ্বালিয়ে রাখল সন্ধ্যার প্রথম তারাটি!

বিকাশ বল্লে—তারপর গাছতলায় শুয়ে ভেউ ভেউ করে খুব খানিকটা কাঁদ্লি—যেমন পরীক্ষায় ফেল ক'রে কেঁদেছিলি বোকার মতো? গ্যাঁটে যা পয়সা ছিল,—তা দিয়ে আফিং বা কার্ব্বলিক এসিড কেনার মতো মুরোদ ছিল না বলেই বুঝি কতগুলো শুক্নো চিঁড়ে ও নারকেলের মালায় করে' খানিকটা ঝোলা গুড় কিনে এনে চিবোতে বসলি? যা খিদে পেয়েছিল! নয় কি? কি বলিস্ রে কাঞ্চন?

অখিলবাবু রুখে বল্লেন—সব সময় ইয়ার্কি করো না বিকাশ। আমার বেড়ে লাগছে শুনতে।

বিনোদ এবার যেন অখিলবাবুকেই লক্ষ্য করে' বলতে লাগল—সন্ধ্যায় যখন বিদায় নিয়ে যেতাম, পারুল বিষাদিতা গোধূলি-বেলাটিরই মতো ছাতে এসে দাঁড়াত।—

বিকাশ বল্লে—শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলি ঘরে নিয়ে যেতে। তোরই জন্য নয় রে হতভাগা!

—ওর চারধারে এমন একটি পবিত্র বৈরাগ্য—

—সে দিন নিশ্চয়ই ওর জ্বর-ভাব ছিল, কিছু খায়নি, মুখ শুক্নো, গা শিথিল, পরণের কাপড় ময়লা—তাই সেটাকে বৈরাগ্য ব'লে ভুল করেছিলি। বোকা!

হঠাৎ বিকাশ প্রশ্ন কর্লে—যাক। বেচারীর নির্ব্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে ত'? ক'টি ছেলে পুলে হ'ল?

বিনোদ বল্লে—সে চিরকুমারী। আমারই জন্য দুঃখের তপস্যা করছে।

—মৃগীরোগ আছে বুঝি? বাপ বুঝি বিয়ে দিচ্ছে না? তাই?

—আমাদের মিলন দেহকে ডিঙিয়ে—

—যেমন লঙ্কা ডিঙিয়েই অযোধ্যা। পথটুকু না পেরিয়েই পথের মোড়। পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বিকাশ বল্লে—পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে, ভাই—জন্ম, প্রেম আর ভগবান। আর সব চেয়ে ঘৃণা করি—বিবাহ আর মৃত্যু। এমন কুৎসিত জিনিষ দুনিয়াতে বুঝি কিছু নেই।

অখিলবাবু অতিষ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে অতঃপর ঝিকে ডাকেন এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে।

সাতাত্তর টাকা মাইনে পায়,—সাত দিনও লাগে না ফুঁকে দিতে। তারপর বাকি তেইশ দিন ব'সে ব'সে হাঁপায় আর বিনোদের আষাঢ়ে গল্প শোনে। আজগুবি কথা বলে সব—জান্‌লা দরজা থাকৃতেও যারা ঘরের দেয়ালে থুথু ফেলে—তারা সব চেয়ে বোকা; যে মেয়ে কবিতা বোঝে বলে—সে সব চেয়ে মিথ্যাবাদী; যে মাষ্টার নিজে চেটে চেটে বই পড়ে' অশ্লীল ব'লে ছাত্রদের পড়তে বারণ করে,—সে সব চেয়ে বড় ভণ্ড।

নিজেকে পর্য্যন্ত ঠাট্টা করে। বলে—বিকাশ বোস্—একটা মার্গী-প্যাটার্নের চেহারা,—হেলে-পড়া হাস্‌না-হানার শাখাটি,—বুকের ভেতর না সেঁধোয় সেই ডরে ধীরে ধীরে চুরুট ফোঁকেন, ডান দিকে সিঁথে কাটেন, গাল পর্য্যন্ত আমেরিকান্ জুলপি রাখেন—দেখতে পারি না। ঘেন্না লাগে। মেয়েমানুষের চুলের গন্ধ শুঁকে বমি আসার মতন। ছোঃ!

সারাদিন যা মুখে আসে, তাই নিয়েই গান করে—সুরের তোয়াক্কা রাখে না। অখিলবাবু মাঝে মাঝে রগড় করে' ভুঁড়ির ওপর চড় মেরে তাল দেন যেন দেয়ালের তিলোত্তমার ঠাকুর-জামাইটি।

বিনোদ আর আমি এক ঘরেই শুই,—আর শোয় ঝুলে ঝুলে জাল ঝুলিয়ে বেকার মাকড়সারা।

দেয়ালের সঙ্গে বিনোদ কথা বলে। বলে—এমনি কতটুকুই বা তুমি? ঠুন্‌কো কাঁচের পেয়ালার চেয়েও সস্তা। তোমাকে তোমার চেয়ে কত বড় ক'রে দেখলাম—সে শুধু আমারই কৃতিত্ব,—আমার একার গর্ব্ব সে। যেখানে তুমি বাস্তব, স্থূল, জাজ্জ্বল্যমান, সেখানে তুমি কত কদর্য্য কিন্তু তোমার চতুপার্শ্বে আমার সাধনার আমার কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছি ব'লেই না আমি আজ অতসীর শাখা হ'য়ে দূর তারকার জন্য আঁকুপাকু করছি। তুমি ত শুধু একটা প্রতিমা নও,—তুমি—

ঈশ্বরের নামটা মুখে আন্‌তে দেরি লাগে। যেন ঐ দেরি করে' উচ্চারণ করার মধ্যে কত অভিমান!

সেই বিনোদই সকাল বেলায় বিকাশকে বল্লে—দুটো টাকা দে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই চাকরি চেয়ে।

বিকাশ বল্লে—তার চেয়ে কিছু ন্যাংড়া আম আর পান্‌তুয়া আন্‌লে কাজ হ'ত।

—তুই ভাবছিস, কিছু হবে না ওতে? আমি সোজা কথা স্পষ্ট করে জানাব যে, আমি খেতে পাচ্ছি না, বাড়ীতে আমার বিধবা মা'র মরণাপন্ন অসুখ—গেল বছরের ঝড়ে আমাদের ঘর একেবারে ভ্যাংটা হয়ে গেছে—

বিকাশ বল্লে—দু'টাকায় অত কুলুলে হয়! একটু কম-সম করেই লিখে দিস ভাই।

রাস্তার বাঁক নিতেই প্রবোধের সঙ্গে দেখা,—নতুন

উকিল। ছেলেবেলায় 'উ' আর 'কিল' ছুটোরই ব্যথা যেন ওর সারা মুখে। গোটা বাজারটাই যেন কাঁধে নিয়ে বাড়ী ফিরুছে।

বল্লাম—এত ঘটা যে? নতুন ছেলের ভাত বুঝি? না, সাধ দেওয়া হবে ফের্?

ও হেসে বল্লে—কাল একটা মোকদ্দমা জিতেছি ভাই। তাতেই একটু—। তুই চল্ না আমাদের বাড়ী। একেবারে খেয়ে যাবি'খন।

তথাস্তু!

কার্নিক্ খেয়ে খেয়ে গলির পর গলি পেরিয়ে যে সুড়ঙটায় আমাকে ও নিয়ে এল,—সেখানে মরণেরও পথ চিনে আসতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে। বল্লাম—এ গলিতে মক্কেল আসে? মোটা হলে ত' ঢুক্তেই পাবে না।

ও বল্লে—কেন, গলির মোড়ে একটা আঙুল-দেখানো সাইন্‌বোর্ড টাঙিয়েছি ত'! সন্ধ্যার থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্য্যন্ত বৈঠকখানার দরজার কাছে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখি।

বল্লাম—ঐ কেরোসিন্‌টা খামোকা গরুচা দিস। বৃথা।

রান্নাঘরের দোরে সমস্ত বাজারটা নামিয়ে ও আমাকে একবারে ভেতরে নিয়ে এল,—অবশ্য রান্নাঘরের দোর থেকে ভেতরটা দু' পা'র দু' ইঞ্চিও বেশি নয়। একটি মেয়ে টেবিলের কাছে বসে' কি লিখছে।

প্রবোধ বল্লে—জ্যোৎস্না, ইনি আমার বন্ধু, ডন্ কুইক্সট্, আর তুই বুঝতেই ত' পার্‌ছিস ইনি—

—আমার বউদিদি।

কথা একটা বলা উচিত ব'লেই বল্লাম।

মেয়েটি লিখেই চলেছে। যেন ওর আচরণে একটি অবহেলা,—জায়গাটা ছেড়ে উঠল না পর্য্যন্ত। কিন্তু কেন যে অসন্তুষ্ট হতে পারলাম না জানিনা। ওকে একটুখানি দেখলাম, যেমন এক ফাঁকে ঝড়ের রাতে বিদ্যুল্লতা দেখি। শীর্ণ মলিন চেহারা,—ভোরের সূর্য্যমুখী যেন বিকালের আলোয় নেতিয়ে পড়ছে,—ঘাড়ের ওপর চুলের ফাঁসটার কাছে ঘোমটাটা একটু শিথিল হয়ে খসেছে,—ললাটে ছুটি ঘামের বিন্দুর ওপর রোদের চিকণ চিকিমিকি,—ওর শাড়ীর আঁচলটা এমন সুন্দর করে' পায়ের কাছে লুটিয়ে না পড়লে সত্যিই যেন সব কিছু ভারি বেমানান হ'ত।

প্রবোধ একটু বিরক্ত হয়েই বল্লে—কি লিখ্‌ছ ওটা?

মেয়েটিও একটু চটেই উত্তর দিলে—গয়লার হিসাব মেলাতে হবে ত'—তখন ত' আবার বক্‌বে। পশু' দিয়েছে মোটে দেড় পো, লিখেছে—দেড় সের।

ব'লেই বেরিয়ে গেল। আঁচলটা লুটোতে লুটোতে যাচ্ছিল।

প্রবোধ তার মোকদ্দমা-জেতার গল্প সুরু করলে। কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ল-পয়েণ্টের' খোঁচা মেরে জজকে ঘাল করলে, ওর বক্তৃতায় বিপক্ষের উকিল কেমন ভেবড়ে গেল, জজ-সাহেব কেমন ওর সওয়ালজবাবের তারিফ্ করলেন—তারই এক ঝুড়ি বক্তৃতা। আমি যে ওর বিপক্ষ দলের উকিল নই, আমাকে এমন বসিয়ে নাস্তানাবুদ করে' যে ওর কিছুমাত্র লাভ নেই,—কে ওকে বোঝাবে? ভালো লাগছে না শুন্‌তে,—তবু, ওর বলতে ভালো লাগছে বলেই শুন্‌ছি।

রাঁধুনে বামুন নেই,—একটা ঠিকা ঝি খালি। তেত্রিশ টাকা বাড়ী ভাড়া—লাইব্রেরির চাঁদা, ট্যাক্স ল-জার্নালের খরচ—গাউনটা এমন ছিঁড়েছে যে আর সেলাই চলে না। এম্‌নি অফুরন্ত বেদনার কথা,—কিন্তু একবার যদি নাম ফাটে! বাড়ী, গাড়ী আর লাইব্রারি,—চাই কি একটা বাগানবাড়ী পর্য্যন্ত।

মুখ ম্লান করে' বলে—ছুটো ছেলে মারা গেল, ভাই। শেষেরটাও যাবে।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে' চলে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায়, ঝিকে বকে, নিজেই বাসন ছুটো মেজে নেয়, প্যাজগুলো কেটে ফেলে, ঝাঁটা দিয়ে বারান্দার নোংরাগুলো সাফ করে, এক ফাঁকে রোগা মরন্ত ছেলে আচম্‌কা কেঁদে উঠলে ওকে শান্ত করে আসে।

আবার চাবির রিঙে শব্দ ক'রে ছুটোছুটি করে, বাজার থেকে কাঁচালঙ্কা ভুলে আনে নি বলে' রাগ ক'রে আপন মনে কি বলে, বোঝা যায় না,—খুন্তি নেড়ে মাছ ভাজে, ঠিক টের পাই, জমাদার এসেছে বলে' ঝিকে আগে নর্দ্দমায় জল ঢেলে দিতে বলে, মাছখেকো বিড়ালটাকে শাসায়।

বসে' বসে' তাই শুনি—একটা হাল্‌কা কবিতা। অমিত্রাক্ষর নয়।

পরে এক ফাঁকে একটা ছোট বাটি ক'রে খানিকটা তেল ও একখানা ফর্সা চুল-পাড় কাপড় এনে আমাকে বল্লে—কলে জল থাক্‌তে থাক্‌তে স্নান করে নিন্‌।

প্রবোধকে বল্লে—তোমারো ত' কোর্টের বেলা হ'ল। আমার এদিকে সব হয়ে গেছে।

দুটি হাতে একটি করে' শুধু সোনার চুড়ি, কাপড়ের পাড়টায় কচু পাতার রং, ঘোম্‌টাটি তেম্‌নি আধেক-খসা।

খাওয়া সেরে প্রবোধ ঢিলে পেণ্টালুনটা পরলে,—গায়ে দিলে জ্বলে যাওয়া আল্‌পাকার চাপকানট', তিনটে বোতাম ছেঁড়া—মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোতামগুলো লাগিয়ে দিলে—জুতোর পেছন থেকে ছেঁড়া মোজার ফুটো দুটো উঁকি মারে,—ওর জুতোর পানে নিশ্চয়ই রাস্তার মুচি আজ লোলুপ চোখে চেয়ে থাক্‌বে।

বল্লে—তুই বেরোবি নাকি কাঞ্চন?

মেয়েটি একটু চড়া গলায়ই বল্লে—ওঁকে ত আর আক্কেল-দাঁতের মতো মক্কেলে পায়নি! উনি জিরিয়ে যাবেন একটু।

প্রবোধ পান চিবোতে চিবোতে ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যায় তারপর।

বল্লাম—আপনি এবার খেয়ে নিন্‌।

—আমি? আমার সব পাট ভেঙে খেতে খেতে প্রায় তিনটে।

—তিনটে?

—হ্যাঁ, ঠাকুরপোই আসেন একটার সময়—কণ্ট্রাক্টারি করেন কি না। ঝিকে বিদায় ক'রে ওঁর ভাত আগ্‌লে বসে থাকি। উনি এসে পৌঁছুলে তবে নিশ্চিন্তি।

পাশে নীচু একটা তক্তপোষের ওপর একটি মাস দশেকের শিশু,—ট্যাঁ ট্যাঁ করছে,—সেই লোহার কারখানাটা মনে পড়ে,—তেম্‌নি ক্লিষ্ট, তেম্‌নি অস্থির।

আদর করে ওকে ছুঁতে যাচ্ছি একটু,—মেয়েটি বল্লে—ওর ভারি অসুখ—

বল্লাম—কি অসুখ ওর?

—দেখুন না চেয়ে—

শিশুর দিকে তাকিয়ে যা না বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝি ওর পানে চেয়ে,—দুটি চোখে বেদনায় কি নির্ম্মল আভা। তারপর আরেকবার শিশুর পানে তাকাই,—একটা ঝড়ে-পড়া পালক-খসা শালিকের ছা,—মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চোখের ওপর একটা ব্যাণ্ডেজের বাঁধুনি,—দাঁতের মাড়িতে ঘা,—যে শিশু আকাশের জ্যোৎস্না হয়ে হাসে, যে শিশুর কামনা সুগন্ধের মতো নববধূর সমস্ত যৌবন ঢেকে মেখে রাখে—

বল্লাম—কি নাম এর?

—মুলোশিনি। এর দুই দাদা ছিল—লেনিন আর ম্যাক্‌সুইনি। বিদায় নিয়েছে।

—লেনিন্‌ কিসে গেল?

—তড়্‌কায়। জন্মের মাস দুয়েক পরে হঠাৎ একদিন বিষের মতো নীল হ'য়ে।

—আর ম্যাক্‌সুইনি?

—প্রায় প্রায়োপবেশনেই।

পরে একটু থেমে বল্লে—আর একটি যখন হবে, নাম রাখ্‌ব আবদুল ক্রিম্‌। এরা সব যাবে, শুধু ভাগ্যের লোহার দ্বারে কপাল ঠুকে—ওদের মাকে ঠাট্টা করে':—আর আমার নাম কি জানেন?

—কি?

—বনজ্যোৎস্না। প্রাকৃতে বলে—বনজ্যোষিনী।

তাই। আমি হ'লে কক্‌খনো ওকে জ্যোৎস্না বলে' ডাক্‌তাম না—বন বলে' ডাক্‌তাম। ওর মধ্যে যেন আমি অরণ্যের ব্যাকুল মর্ম্মর শুনতে পাচ্ছি—অরণ্যের সেই ব্যাকুল ও বিস্তৃত স্তব্ধতা।

দরজায় কে কড়া নাড়্‌লে। বন বল্লে—ঠাকুরপো এসেছেন। কড়া নাড়া শুনেই চিন্‌তে পারি।

চলে' যায়—আঁচলটা তেমনি লুটোতে লুটোতে চলে।

একটা নীল খাম নিয়ে বিনোদ লাফালাফি লাগিয়েছে,—ওর বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে একটা।

বিনোদ খামটা না খুলেই খুসি, বলে—কোনো মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারিই হয়ত। কিম্বা কোনো সাহেব হয়ত বাঙলা পড়ানোর জন্য মাষ্টার চায়। কেয়াবাৎ।

অখিলবাবু ঈর্ষায় ওর দিকে একটু তাকায়। বলে—বাঙলার মাষ্টারকে আর কত মাইনেই বা দেবে? ত্রিশ টাকার বেশি?

—তিনশোও হতে পারে। বিনোদ বলে।

বিকাশ বলে—দেখিস্, তোর পারুলের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র না হলে হয়!

বিনোদ একটু নেড়ে চেড়ে অনেক দেরি করে' খামটা খুলে ফেলে। প'ড়েই সারা মুখ যেন এতটুকু হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকালায়—ব্যাপার কি?

কিছুই না তেমন;—আরেকটা ইংরিজি দৈনিক কাগজ বিনোদকে জানিয়েছে যে, তাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর ঢের কম,—এক ইঞ্চি মোটে দশ আনা,তিন ইঞ্চি দেড়টাকা,—সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষা করে' দেখ্‌লে পারে।—

বিনোদ তারপর ঘরের মধ্যে খানিক অস্থির হয়ে হাটে, আর দাড়ি হাতায়। পরে ফের্ বিকাশের কাছে হাত পেতে বলে—আমাকে আর দুটো টাকা দে।

—কেন? এই নতুন কাগজটায় আরেকটা বিজ্ঞাপন ছাড়্‌বি নাকি?

—না। ছিপ সুতো আর বঁড়শি কিন্‌ব। ঐ ডোবার ধারে বসে' বসে' মাছ ধর্‌ব এবার।

বিনোদ খেজুর গাছের গুড়িতে ঠেস্ দিয়ে বসে' পচা ডোবার নীল্‌চে জলে ছিপ ফেলে চুপ করে' ঠায় বসে' থাকে—আর চোখ বুজে বুজে বুঝি পারুলের কথাই ভাবে,—সেই জ্যৈষ্ঠের রোদে ষোল মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবার কথা,—পারুলের সঙ্গে একটিবার দেখাও হল' না।

বিকাশ খেপায়। বলে,—একটা পুঁটি মাছও আট্‌কাতে পার্‌লি না এতদিনে? তোর পারুলকে একটা প্রেমপত্র পাঠা' না, গয়না বেচে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিক্।

বিনোদ ছিপ ছেড়ে দিলে। এবারে বসে' বসে' টিনের তার দিয়ে নানান্ রকম আজগুবি জন্তু বানায়, টিয়া, আরসুলা, মোষ,—পাখীর খাঁচা বানায়, দালান, ইজি-চেয়ার। বলে—এই খাঁচার থেকে পাখীটাকে বা'র কর্‌তে পারিস্ ত' দাড়িগুলো কামিয়ে ফেল্‌ব এবার।

বহু কসরৎ ক'রেও কেউ পারি না। ও কিন্তু হঠাৎ একটা কায়দা ক'রে খাঁচার দরজা ছুটো খুলে পাখীটাকে বা'র ক'রে দিলে। মন্দ কৌশল ত' নয়,—খুব সহজ, কিন্তু কারু মাথায় আসে না।

একদিন দেখ্‌লাম বিনোদকে—গায়ে সেই রঙ-চটা আল্‌খাল্লাটা, মাথার জটা বাঁধা, দাড়িগুলিতে উকুন পড়েছে,—রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই তারের খেলনাগুলো বিক্রি করছে। ইস্কুলের ছেলেরা চারদিক ছেঁকে ধরেছে—পয়সা দিয়ে কিন্‌ছেও, বাড়ী গিয়ে পড়শী বন্ধু ও বোন্‌দের তাক্ লাগিয়ে দেবে—

সমস্ত রাস্তার বিপুল জনতার এক কোণে ওকে একটুও খাপ খায় না, ছন্দ পতন হয়েছে, কিন্তু রাত্রে ট্যাঁকে পয়সা আর গাঁজা নিয়ে যখন মেস্-এ ফিরে আসে—তখন একটা কবিতা আপনা থেকেই দুলে' ওঠে যেন।

তবু বিনোদ বলে, কিছুই হয় না নাকি ওতে। বলে—আবার সরে পড়্‌ব। কপালে আছেই দুঃখ—। দাড়িগুলিও আরো কতকটা বেড়েছে, ভালোই হ'ল।

বিকাশ বলে—খা খা, আরো খা খানিকটা প্রেমের কুইনিন্। এবারে ঠেলা বোঝ।

বিনোদের বিষণ্ণ অথচ সুকোমল মুখ দেখে মনে হয়,—কি মনে হয় জানি না; শুধু ওর সজল চোখদুটি দেখ্‌লে কি যেন মনে হয়—

প্রবোদের বাড়ীর দরজার লণ্ঠনটা যেন আমারই জন্য জ্বালানো—লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে মনে হ'ল। মনে হ'ল, ওকে রাত্রে একবার দেখে আসি।

সব নিঝুম লাগ্‌ছে,—এরি মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে নাকি সব? সদর দরজা খোলাই ছিল,—ঝি এখনো যায় নি। রান্নাঘর ধোয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যাবার সময় লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবে।

বৈঠকখানা ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রবোধের সঙ্গেই 'ল-পয়েণ্ট' সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনে আসা যাক্। ঢুকে পড়্‌লাম।

প্রবোধ নয়, বনজ্যোৎস্না। লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে কি লিখছে। ওর চারদিকে তেমনি একটি নিস্তব্ধ উপেক্ষা,—উদাস ঔদাসীন্য। লেখাটা হাত দিয়ে ঢেকে শুধু একটু হাস্‌ল। কিন্তু আমি ত' ওর লেখা দেখতে আসিনি।

বল্লাম—কি লিখ্‌ছেন?

—শুন্‌লে হাস্‌বেন, আমাকে বোকা বলে' ভাববেন।

—না, না।

—হ্যাম্‌লেট্‌কে একটা চিঠি লিখ্‌ছি।

—হ্যাম্‌লেট্‌কে?

—হাঁ, ঐ ত ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কাল কীট্‌সের ফ্যানিকে একটা চিঠি লিখেছি,—পারি ত' ডন্ জুয়ান্‌কেও লিখ্‌তে হবে একটা।

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই,—বিকাশ হলে হয়ত বল্‌ত ন্যাকামি,—কিন্তু ওর ঐ অমন করে' বসা থেকে সুরু করে' অমন করে কথা কওয়াটি পর্য্যন্ত মেঘদূতের মতো করুণ লাগে। মনে হয় বিনোদের মুখের সঙ্গে এর মুখের কোথায় যেন একটা মিল্ আছে।

বল্লে—এই দেখুন কালি আর কলম দিয়ে হ্যামলেটের একটা ছবি এঁকেছি।

কিছুই না—ইজি চেয়ারে শুয়ে একটি লোক সিগারেট টান্‌ছে।

তারপর হঠাৎ উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বলে—বসুন, খোকাটা উঠেছে,—আর ওঁর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি।

খানিক বাদে আবার আসে,—এবার আর আঁচলটা লুটোয় না। বল্লে—লেনিন্ যখন মরেছিল তখন খুব কেঁদেছিলাম, ম্যাক্‌সুইনি যখন মরে, তখনো খুব কষ্ট হয়েছিল,—বেচারার কি যে হল, আটাশ দিন ধরে' কিছু মুখেই নিলে না, বুকের দুধ পর্য্যন্ত না,—যেন কি অভিমান! আর, এ যখন মরবে, মনে হচ্ছে, একটুও কাঁদ্‌তে পার্‌ব না। কাঁদ্‌তে ভুলে গেছি।

আবার চলে যায়,—ঠাকুরপোর জন্য ভাত চাপা দিয়ে রেখে আসে, নেবু জল মিশ্রি বিছানার কাছে টুলের ওপর রাখে, বিছানাটা পাতে,—চটি জুতো পর্য্যন্ত এগিয়ে রেখে দেয়, পা ধুয়ে এসে পরবে।

আবার এসে বসে, বলে—যে ঘট ভরলও না, ভাঙলও না, তাকে নিয়ে কি করব? ভাসিয়ে দিয়েছি।

জিগ্‌গেস করলে—এত রাতে এখনো বাড়ী ফেরেন নি?

—বাড়ী নেই বলে'।

ও হঠাৎ ম্লান স্বরে বল্লে—দেখুন, আমার খালি জান্‌তে ইচ্ছা করে—কত কথা। কিন্তু যত জান্‌ব, ততই ত দুঃখ। যাই, কালকের তরকারীগুলি কুটে রাখি গে।

ঝি চলে গেছে। বাইরের লণ্ঠনটা নেবানো। ও আবার এসে বসে। দু' জনেই চুপ ক'রে থাকি। পাশের ঘর থেকে প্রবোধের জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি।

তারপর কোন কথা না বলেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাই। ও আস্তে আস্তে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয় আবার ওর ঠাকুরপো যখন আস্‌বে, উঠে খুলে দেবে।

তাস খেলা হচ্ছে।

বিকাশ বল্লে—ইস্কাবনের বিবিটা এবারে অখিলদার কাঁধেই চাপিয়ে দিতে হবে।

অখিলবাবু বল্লেন—চারটেই দাও না কেন, নারাজ নই।

রাতের খাওয়া দাওয়া চুকে গেছে—মেসের ও-পাড়া

নাক ডাকাচ্ছে—নিসাড়। বারান্দায় কার পায়ের হাল্কা আওয়াজ পাওয়া গেল। বল্লাম—ঝি এখনো বাড়ী যায় নি?

দরজার কাছে কে এসে বল্লে—বিকাশবাবু আছেন?

সুদূর থেকে যেন কথা এল,—ঘুমে-পাওয়া হাওয়ার কাকানির মতো।

দেহ ত' নয়, দীপশিখা! জ্বল্‌ছে অথচ বাতাসে কাঁপ্‌ছে। এখুনি যেন নিবে যাবে।

বিকাশের গলা দিয়ে বেরুল—কে, বেণু? এস। বোস' এসে।

যেন এতে এতটুকু বিস্মিত হবার নেই। বেণু আস্‌বে এ যেন ওর জানা কথা। যেমন জানা কথা সকাল বেলা গয়লা আসবে, বিকেলে আপিস-ফেরৎ অখিলবাবু আস্‌বেন। আশ্চর্য্য!

আমরা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লাম। মেয়েটি মাথা হেঁট করে রেখে বল্লে—যদি দয়া ক'রে একটা কথা শোন,—ভারি বিপদে প'ড়ে এসেছি।

বিকাশ রূঢ় গলায় বল্লে—এখানেই বল,—এরা শুন্‌লে কিছু ক্ষতি হবে না।

বল্লাম—আমরা চল্লাম অখিলদার ঘরে।

বিকাশ বল্লে—না। বল, কি চাই?

মেয়েটি সঙ্কোচ করে' যেন কথা কইতে পারছে না,—ওর চোখে জল এসে পড়েছে,—গলাটা বুজে আস্‌ছে। থেমে থেমে বল্লে—ওঁর খুব অসুখ, অবস্থা ভালো নয়,—তুমি যদি একটিবার আমার সঙ্গে আস।

মনে হচ্ছে আমরা যদি এখানে না থাকতাম, ও নিশ্চয়ই বিকাশের পা দুটো বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরত। যেন ঐ পায়ে কত অপরাধ করেছে—

বিকাশ নির্দ্দয়ের মতো বল্লে—কার? তোমার স্বামীর? কেন, ছ'শো টাকা যার মাইনে,—মোটরকার, তেতলা বাড়ি—তার কি আর ডাক্তারের অভাব হয়? আমি ত' ডাক্তার নই।

—কিন্তু তুমি সে-বার আমার অসুখের সময় কি প্রাণপণ সেবা করে' আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলে। তেম্‌নি করে' যদি ওঁকে বাঁচাও—

যেন ভিক্ষা চাইছে। বিকাশ যেন বিধাতা।

বিকাশ ব্যঙ্গ করে' বল্লে—তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

কী নিষ্ঠুর এই বিকাশটা! ওর বুকটা যেন আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বেণু এবার সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লে। মনে হ'ল এখুনিই যেন বিকাশের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়ে কপাল কুটে কুটে মরবে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একলা নেমে চলে' গেল।

বিকাশ বারান্দায় উঠে এল। রেলিঙটায় ভর্ দিয়ে দাঁড়াল একটু। বল্লাম—এ কি কর্‌লি বিকাশ? শিগ্‌গির চল্ তুই—

বিকাশ বল্লে—কেন, আমি কি ভাড়াটে নার্স নাকি যে যার তার অসুখ হলেই ছুটে যেতে হবে—রাত জেগে?

—যার তার অসুখে নাই বা গেলি। এ যে বেণুর স্বামীর—

—কক্‌খনো না।—এমন ভাবে হাত ঘুরাল যে লেগে কাঠের রেলিঙটা ঝেঁকে উঠ্‌ল।

—তবে শিগগির আমাকে ঠিকানা দে—আমি যাচ্ছি। একলা পথে—

—নম্বর জানি না, তবে বাড়ীটা চিনি। নাম 'বেণুকুঞ্জ'।

পথ চিনে চিনে যখন এলাম,—রাস্তায় মোটরের ভিড় লেগে গেছে। ভিতর থেকে কান্নার তুমুল রোল উঠেছে। বুঝ্‌লাম—নেই; হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে গেলাম। মৃতের মন্দিরে কারুরই জন্য নিষেধ নেই। সবাই ভাবলে—আমি বেণুর স্বামীর বন্ধু, হয়ত বা বেণুরই।

বেণুর সে কী কান্না! অনেকদিন এমন কান্না শুনিনি। শুধু শুনেছিলাম পদ্মার সেই অকূল বন্যাস্রোত,—শুনেছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরের পারে সেই উদ্দাম বৃষ্টিজলধারা। বুকটা জুড়ায়।

সমস্ত সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ,—গীতা উপনিষৎ—সব ভাসিয়ে ছারখার করে' দিচ্ছে। প্রলয়ের কালে সাগর